

প্রথম ভাগ

আধুনিক বিজ্ঞান

রায় ও বন্দ্যোপাধ্যায়

নলেজ হোম • কলিকাতা-৬

A Text-book on 'General Science' for Class VI written strictly according to the Syllabus as prescribed by the Board of Secondary Education, West Bengal, for Class XI and Class X Schools. Notification No. SYL/1/62 Dated 30th. March, 1962.

আধুনিক বিজ্ঞান

১ম ভাগ

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

শ্রীসুশীল রায়, এম্. এস্-সি.
পুরাতন মালদহের কে. সি. স্কুলের শিক্ষক
ও
শ্রীঅঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এস্-সি.
লেক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও সাকৃতেড়িয়া ডিসেরগড় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা।

নলেজ হোম
৫৯, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

*

প্রকাশক :
এস্. কে. মজুমদার, বি. এ.
নলেজ হোম,
৫৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ১৯৬২

দাম : এক টাকা বার নয়া পয়সা

প্রিণ্টার :
শ্রীসমীর কুমার মজুমদার, এম. এস-সি.
বেঙ্গল প্রিণ্টার্স
১১৭।১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

ভূমিকা

মানুষের পদক্ষেপ আর ধীর নেই। কত যুগই না সে অতিক্রম করলো এই কয়েক বছরে—ষ্টীম, জেট ইত্যাদি পেরিয়ে সে এখন রকেট যুগে। গতিপ্রখরতাই প্রাণের ধর্ম, যুগের ধর্ম। বিজ্ঞান করেছে সভ্যতার মধ্যে সেই গতির সঞ্চার। এ যুগে মানুষ হাঁটে 'বিজ্ঞানে', কথা বলে 'বিজ্ঞানে', খায় 'বিজ্ঞানে', সব কিছুই 'বিজ্ঞানে'। তাই বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে আর জীবনের কথা ভাবা যায় না। এ যুগে বাস করতে হ'লে প্রত্যেককেই বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে হবে।

স্কুলে 'সাধারণ বিজ্ঞান' শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন জিনিস সম্বন্ধে সামান্য কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সরবরাহ করা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে আমরা যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছি তাদের সম্বন্ধে কিছু জানাই হ'ল সাধারণ বিজ্ঞান পড়ার উদ্দেশ্য। এ পড়ে ছাত্রছাত্রীরা বৈজ্ঞানিক হবে না ঠিকই, কিন্তু এর থেকে তাদের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগবে। জাগবে আরো নতুন জিনিসকে জানবার ইচ্ছা।

আলোচ্য বই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নির্দেশ অনুযায়ী লেখা। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য বোঝানোর জন্য তাদের নির্দেশ অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়েছে আগে তথ্য পরে তত্ত্ব পরিবেশন করবার। কোন রকম জটিলতার ভেতর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়নি। তারা যদি উপকৃত হয় তাহলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

কলিকাতা
পনেরই নভেম্বর,
১৯৬২

সুশীল রায়
অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE

(for both class-X and class-XI schools)

Notification No. SYL/1/62, dated 30th March, 1962.

Board of Secondary Education, West Bengal.

CLASS VI

Objectives : 1. To produce a general awareness of the common natural phenomena in relation to human life.

2. To develop power of observation of objects and phenomena around us.

Course contents	*Demonstration & Experiments*
A. NON-LIVING : The Earth (1) Above the earth's surface : Atmosphere, air, water-vapour; clouds, wind, storm ; thunder and lightning ; rain, hail snow, dew, fog, mist, monsoon, air becomes cooler higher up in the hills (snow on mountain tops), in aeroplanes, air becomes less dense higher up ; difficulty in breathing on mountains. (These topics should be treated mainly in a descriptive manner.)	Experiments to show that air contains water-vapour, air supports breathing ; observations of sky and atmosphere in different seasons ; direction of wind.
(2) Below the earth's surface (a) Minerals—coal, iron, oil —their origin (theory not required.)	Demonstration with charts and diagrams.
(b) Water—wells and tube-wells.	

(3) All objects are attracted by the earth : deduction from the common experience of falling bodies.

(4) Beyond the earth.

(i) Heavenly bodies : The simple idea of solar system —the sun, planets, the satellites especially the moon. Difference between Planets and Stars. The sun as a source of heat and light—variation of heat in different seasons.	Charts, diagrams, and observations.

B. LIVING BEINGS.

1. Difference between living and non-living.

(1) A living thing feeds ; it persists though it is ever changing.	Observation of plants, trees, branches, leaves, flower, seeds, leaves fall off and new ones grow again. Feeding of plants and animals.
(2) A living thing breathes : if air is cut off both plants and animals die (even fish needs air).	Show effect on plants and animals when air is not renewed.
(3) Living things produce living things ; seed changes to plants and plants produce seeds, eggs-hens-eggs.	

(4) Living things react to their surroundings and are effected by them.

To show examples around you, as plants turn to light, climbing plants coil round supports, roots spread out towards moistsome soil, leaves and flowers close up at night, behaviour of earth-worm and house-fly.

(a) Plants react to light, temperature, gravity and water.

(b) Animals also react to what they see, hear, smell and test.

II. Difference between plants and animals :

(1) Animals and plants require different kinds of food materials.

Points of difference to be illustrated by suitable examples.

(2) Animals have usually a definite size and shape, whereas plants grow in all direction.

Compare an animal with a tree.

III. Some useful plants and animals.
(Indicate the use of the following).

(1) Plants providing materials for food, clothing and dwelling : Rice, wheat, potato, onion, radish, pea, palang, gourd, cauliflower and cabbage, mango, guava, pine-apple, jack-fruit, tomato, coconut, orange ; cotton, jute and timber.	These points should be illustrated by suitable examples from everyday life and actual specimens should be demonstrated wherever possible.
(2) Animals providing materials for food, clothing, hide : fish, goat, duck, hen, sheep, cow. Animals work for man : Bullock, horse, elephant.	

—সূচীপত্র—

পৃষ্ঠা

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

ভূপৃষ্ঠের ওপরের স্তর

বিচিত্র এই পৃথিবী। কত খেলনা দিয়ে সাজিয়ে রেখেছেন প্রকৃতি তাঁর খেলাঘর। গাছপালা—সেও আবার কত রকমের, পশুপাখী সেও বিভিন্ন রকমের। পাহাড় পর্বত নদী হ্রদ সমুদ্র ইত্যাদি কত কি না সরঞ্জাম! প্রত্যেক দিন দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে বলে—এই বৈচিত্র্য আর তত আমাদের চোখে পড়ে না। তবে একবার যদি স্থিরভাবে ভেবে দেখা যায় তাহ'লেই বুঝ্‌তে পারা যাবে পৃথিবীর এই আসল রূপ।

শুধু ভূপৃষ্ঠই নয়। এ ছাড়াও একটা জগৎ আছে যার কথা আমরা মাঝে মাঝে ভুলেই যাই। সেটা হ'ল এই ভূপৃষ্ঠের উপরের ফাঁকা জায়গাগুলো। এই শূন্যতারও একটা বৈচিত্র্য আছে। এর সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানবার আছে। ঐ ফাঁকা জায়গাটা কি? কি এর কাজ? এইসব প্রশ্নেরই আলোচনা করবো এখন।

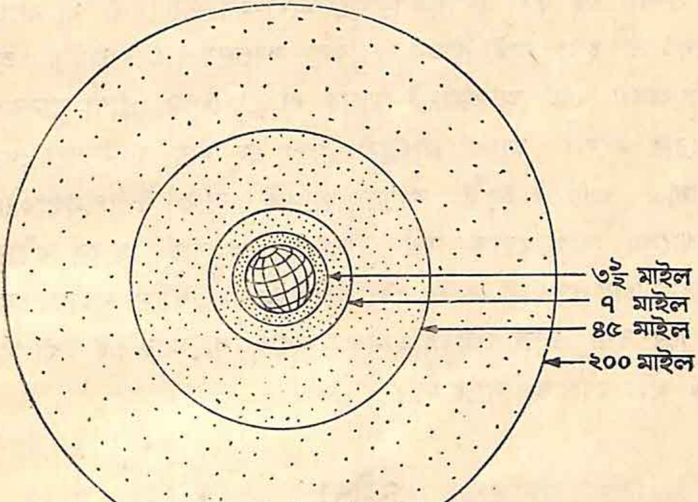
বায়ুমণ্ডল

গাছপালা ঘরবাড়ী দিয়ে সাজানো এই পৃথিবী। মানুষ তার সভ্যতার তৈজসপত্র দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে তার বাসভূমিকে। প্রকৃতিও তাকে সাহায্য করেছে; কিন্তু সব জায়গা জুড়ে তো আর ঘরবাড়ী গাছপালা নেই। বাকি অংশটুকু কি শুধুই খালি? না,

কোন অংশই খালি নেই। সব খালি জায়গাই এক গ্যাসীয় পদার্থে ভর্তি, একেই আমরা বলি বায়ু। বায়ু স্বচ্ছ ব'লে একে আমরা দেখ্‌তে পাইনা। কিন্তু আমরা না দেখ্‌তে পেলে কি হবে পৃথিবীর ওপরে সব অংশই বায়ু দিয়ে ভর্তি। এই বায়ুর গন্ধ নেই, স্বাদ নেই, রঙ নেই। সাধারণভাবে এর অস্তিত্ব আমরা বুঝতে পারি না, কিন্তু ঝড়ের সময় যখন বায়ুপ্রবাহ হয় তখন তার অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ভূপৃষ্ঠের চারদিক এই বায়ু দিয়ে ঘেরা। এটাকে পৃথিবীর একটা আবরণ বলা যায়। পৃথিবীর চারদিকে এই যে বায়ুর আবরণ ঘিরে আছে—তাকেই বলা হয় **বায়ুমণ্ডল**। পৃথিবীর বুকের ওপর পা রেখে আমরা এই বায়ুমণ্ডল ঠেলে হাঁটা-ঘোরা করি। এক কথায়, আমরা বায়ুর মধ্যেই ডুবে আছি।

ভূপৃষ্ঠের ওপরে যে বায়ুমণ্ডল আছে তার কতকগুলো স্তর আছে, এই বায়ুস্তর ওপরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ওপরের বায়ুস্তরগুলো তার ক্রমশঃ নীচের বায়ুস্তরগুলোর ওপর কিছু-না-কিছু চাপ দিচ্ছে। এই চাপের ফলে সবচেয়ে নীচের বায়ুস্তর অর্থাৎ পৃথিবীর সংলগ্ন বায়ুস্তর খুব বেশী ঘন। ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩½ মাইল ওপর পর্যন্ত এই বায়ুস্তর বেশ ঘন। এই অংশে আমরা স্বচ্ছন্দে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারি। কিন্তু ক্রমশঃ ওপরের বায়ুস্তরগুলো হাল্‌কা হ'তে থাকে। ৩½ মাইলের পর থেকে ৭ মাইল পর্যন্ত অংশের বায়ুস্তর এত হাল্‌কা যে আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বায়ু হাল্‌কা হওয়া মানে সংগে সংগে অক্সিজেনের ভাগ কম হওয়া। আর এটাই হ'ল শ্বাসকষ্টের কারণ। এর পরের স্তর প্রায় ৪৫ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত; এখানে অক্সিজেনের ভাগ আরো কম। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তাতে ভূপৃষ্ঠের ওপরে প্রায় 200 মাইল পর্যন্ত এই

বায়ুস্তর বিস্তৃত আছে। তবে একেবারে ওপরের বায়ুস্তরে অক্সিজেন নেই। অক্সিজেন না হ'লে আমরা বাঁচতে পারিনা, তাই যারা পাহাড়ে উঠে তারা সংগে করে অক্সিজেন নিয়ে যায়, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস নেওয়ার জন্য।



১নং চিত্র—(বায়ুমণ্ডল)

বায়ুর উপাদান

এতক্ষণ আমরা যে বায়ুর কথা ব'ল্‌লাম তা একটা মাত্র পদার্থ নয়। বায়ু হ'ল বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই অক্সাইড ইত্যাদি আরো অনেক রকম গ্যাস আছে। যে সব গ্যাসের সংমিশ্রণে বায়ু তৈরী তাকে আমরা ব'ল্‌বো

বায়ুর উপাদান। এ ছাড়া বায়ুতে জলীয় বাষ্পও কিছু আছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জলাশয় থেকে সব সময় সূর্যের তাপে জল বাষ্প হ'য়ে যাচ্ছে। সেই জলীয় বাষ্প বায়ুর সংগেই মিশে থাকে। এই সম্বন্ধে পরে আমরা আরো জান্‌বো।

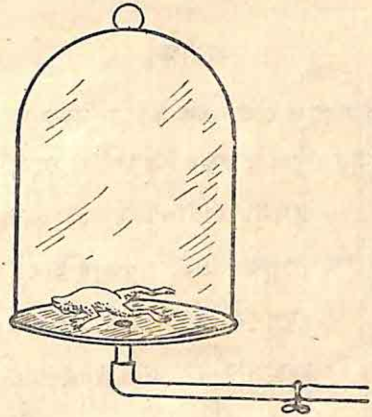
এখন এই সব উপাদানগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী যা বায়ুতে থাকে তা হ'ল নাইট্রোজেন। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হ'ল অক্সিজেন। এই অক্সিজেনই মানুষ বা যে-কোন প্রাণী শ্বাসকার্যে ব্যবহার করে। আমরা প্রশ্বাসের সংগে যে বায়ু টানি তার থেকে শুধুমাত্র অক্সিজেনটুকুই কাজে লাগাই, বাকি উপাদানগুলোকে নিঃশ্বাসের সংগে ছেড়ে দিই। আমরা যে বায়ু ছাড়া বাঁচতে পারিনা তার একমাত্র কারণ হ'ল অক্সিজেন। এখানে পরীক্ষা করে দেখাবো বায়ু ছাড়া জীবের শ্বাসকার্য সম্ভব নয়, আর এই শ্বাসকার্য ছাড়া জীব বাঁচতেও পারে না।

পরীক্ষা

উপকরণ ঃ—একটি বেলজার, একটি জ্যান্ত ব্যাঙ আর বায়ু-কিষ্কাশন যন্ত্র।

পদ্ধতি ঃ—বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের চাকৃতির ওপর জ্যান্ত ব্যাঙটাকে সাবধানে ধরে রেখে বেলজারটা চাপা দাও। বেলজারের তলাটা ভেস্‌লিন নিয়ে ভাল করে আট্‌কাও যাতে করে বাইরের বাতাস না ঢুক্‌তে পারে। ব্যাঙটা ভেতরে লাফাতে থাক্‌বে। এই অবস্থায় বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে বেলজারের বায়ু বের করে নাও। দেখবে বেলজারে সম্পূর্ণ বায়ু যখন বের হ'য়ে আস্‌বে তখন ব্যাঙটা আস্‌তে আস্‌তে ঝিমিয়ে পড়ছে, তার বুকের ধড়পড় প্রায় বন্ধ হ'য়ে

এসেছে। এই অবস্থায় বেশীক্ষণ না রেখে তাড়াতাড়ি আবার বেলজারের ভেতরে বায়ু ঢুকাও, দেখবে ব্যাঙটা আস্তে আস্তে আবার চঞ্চল হ'য়ে উঠ্ছে।



২নং চিত্র

সিদ্ধান্তঃ—এই পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে বায়ু ছাড়া প্রাণীর শ্বাসক্রিয়া চল্তে পারে না।

বায়ুর অক্সিজেনের ভাগ কমে গেলেই শ্বাসকার্যের কষ্ট হয়, সে পরে আমরা ধীরে ধীরে শিখ্বো। তবে এইটুকু জেনে রাখার দরকার যে এই কারণে শরীর অসুস্থ হ'লে অক্সিজেন দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসকার্য চালানো হয়। পাহাড়ে যারা উঠে তারাও সংগে করে অক্সিজেন নিয়ে যায় ওপরের বায়ুস্তরে অক্সিজেনের ভাগ কম বলে।

এ ছাড়া বায়ুর আর একটা উপাদান জলীয় বাষ্পের কথা বলে আমরা এই আলোচনা শেষ করবো। বায়ুতে যে জলীয় বাষ্পও

থাকে তা আমরা দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজের মধ্যেই দেখ্তে পাই তবে লক্ষ্য করি না, এখানে একটা সাধারণ পরীক্ষা থেকে আমরা সেই সত্যের প্রমাণ করবো।

পরীক্ষা

উপকরণ :—এক গ্লাস জল, এক টুক্‌রো বরফ।

পদ্ধতি :—গ্লাসের জলে বরফের টুক্‌রোটা ফেলে দাও, তার আগে গ্লাসের বাইরের দিকটা ভাল করে মুছে নাও। কিছুক্ষণ এই অবস্থায় গ্লাসটাকে রেখে দিলে দেখ্‌বে গ্লাসের বাইরের দিকটা কি রকম কুয়াশার মত আব্‌ছা হয়ে গেছে; একটু একটু জলও গড়িয়ে পড়ছে। এই জল গ্লাসের ওপর দিয়ে বা গ্লাস ফুটো হ'য়ে আসেনি, তবে?



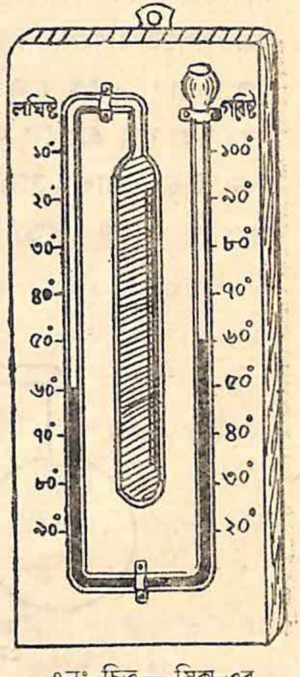
৩নং চিত্র

সিদ্ধান্ত :—বাতাসের জলীয় বাষ্পের কণাগুলো বরফ ভর্তি ঠাণ্ডা গ্লাসের সংস্পর্শে এসে জমে জলে পরিণত হ'চ্ছে। আর তাই গ্লাসের গায়ে জম্‌ছে। বায়ুতে জলীয় বাষ্প না থাক্‌লে এটা কোন দিন সম্ভব হ'তো না।

আবহাওয়া

আবহাওয়া ব'ল্‌তে আমরা সাধারণভাবে প্রাকৃতিক অবস্থাকে বুঝি। এটা নির্ভর করে বিশেষ করে বায়ুর উষ্ণতা আর আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর।

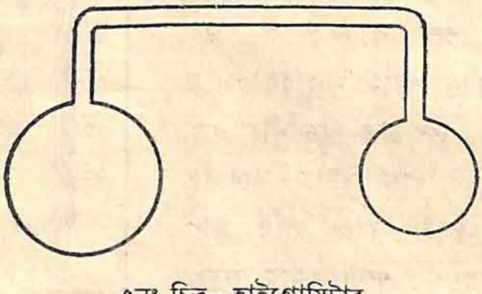
বায়ুর উষ্ণতা :—আমরা যেমন গায়ে জ্বর মাপি থার্মোমিটার দিয়ে তেমনি বায়ুর উষ্ণতাও মাপা যায় থার্মোমিটার দিয়ে। সাধারণত বায়ুর উষ্ণতা মাপবার জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তাতে ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা থাকে। অবশ্য এই ফারেনহাইট স্কেলের মাপকে সেন্টি-গ্রেড স্কেলের মাপেও পরিবর্তিত করা যায়। কিন্তু সাধারণ গঠনের থার্মোমিটার দিয়ে বায়ুর তাপ মাপার অসুবিধা আছে, কারণ বায়ুর তাপ প্রতি মুহূর্তেই বদলাচ্ছে। তাই কারু পক্ষে সম্ভব নয় সারাক্ষণ ঐ থার্মোমিটারের কাছে বসে থাকা। এর জন্য বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ ধরনের থার্মোমিটার ব্যবহার করেন যার দুটো বাহু আছে আর প্রত্যেক বাহুতে একটা করে সূচক আছে। দু' দিকের সূচকের নিচের অংশ দেখে স্থির করা হয় গত 24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ছিল। এই থার্মোমিটারের নাম হ'ল সিক্স-এর চরম ও অবম থার্মোমিটার।



৪নং চিত্র— সিক্স-এর চরম ও অবম থার্মোমিটার

বায়ুর আর্দ্রতা :—বায়ুতে জলীয় বাষ্প থাকে। এই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনুযায়ী বায়ুর আর্দ্রতা ঠিক করা যায়। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের ভাগ যত বেশী হবে বায়ুর আর্দ্রতা তত বেশী হবে। পৃথিবীর বুকের, নদী-পুকুর-খাল-বিল প্রভৃতির জল

প্রতিনিয়ত সূর্যের তাপে বাষ্প হ'য়ে বায়ুর সংগে মিশে যাচ্চে। এখন বায়ুতে জলীয় বাষ্পের স্থিতিও নির্ভর করে তাপের উপর। সাধারণ অবস্থার যদি আমরা এক গ্লাস জলে চিনি দিতে থাকি, সেই চিনি গল্‌তে থাকবে, কিন্তু এমন একটা সময় আস্‌বে যখন আর চিনি গল্‌ছে না। একে বলে সংপৃক্ত দ্রবন, কিন্তু এখন যদি জলটাকে গরম করা যায় তাহ'লে আবার কিছু চিনি ঐ জলেই গল্‌ছে। কিন্তু যখন ঐ জল আবার ঠাণ্ডা করা হবে তখন অতিরিক্ত চিনি স্ফটিকের আকারে তলায় পড়ে যাবে। বাতাসেরও ঠিক একই অবস্থা।



৫নং চিত্র—হাইগ্রোমিটার

ঠাণ্ডা বাতাস যতটা জলীয় বাষ্প গ্রহণ কর্‌তে পারে গরম বাতাস তার চেয়ে বেশী পারে। জলীয় বাষ্প যেন বাতাসে দ্রবীভূত হ'য়ে থাকে আর উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী এই পরিমাণগত পার্থক্য হয়। এই কারণে গ্রীষ্মকালে গরম বাতাসে জলীয় বাষ্প প্রচুর থাকে এবং শীতকালে কমে যায়। বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হয়।

বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য এক ধরনের বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এর নাম হাইগ্রোমিটার। তোমরা আবহাওয়ার খবরে দেখে থাক্‌বে লেখা থাকে বায়ুর আর্দ্রতা 84। এর অর্থ—যত পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে থাক্‌লে বায়ু সংপৃক্ত হ'তো সেদিন তার 84 ভাগ আছে।

শিশির

"শাপ্‌লা শালুকে সাজাইয়া সাঁঝি, শরতে শিশিরে নাহিয়া ;
শিউলী ছোপানো শাড়ি পরে যেন আগমনী গান গাহিয়া।"

বর্ষার শেষ থেকে সকালে উঠে দেখতে পাওয়া যায় ঘাসের ডগায় সব জল জমে আছে, মাটিও ভেজা ভেজা লাগে ; মনে হয় রাতে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে। একেই তো আমরা বলি শিশির। সূর্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ কর্‌লে, দেখতে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু এই জল আসে কোথা থেকে ? বৃষ্টি ছাড়া তো আকাশ থেকে জল আস্‌তে পারে না। কিন্তু বৃষ্টি যে হয় না এতো নিশ্চিত ; তবে ?

দিনের বেলা সূর্যের উত্তাপে পৃথিবীর ওপরের সমস্ত বস্তুই গরম হয়। সেইজন্য ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বাতাস জলীয় বাষ্পে অসংপৃক্ত থাকে। এখন রাতের বেলা ঐ সব জিনিস ঠাণ্ডা হ'তে সুরু করে, সংগে সংগে বাতাসও ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। এইভাবে ঠাণ্ডা হওয়ায় বাতাস ক্রমশঃ জলীয় বাষ্পে সংপৃক্ত হ'য়ে উঠে। এরপর বাতাস যদি আরো ঠাণ্ডা হয় তা'হলে অধিক পরিমাণ যে জলীয় বাষ্প তা ঘনীভূত হ'য়ে জল হয়। এই জলবিন্দুই শিশির আকারে গাছপালা বা মাটিতে পড়ে। সাধারণত বাতাসের আর্দ্রতা বেশী থাক্‌লে, আকাশ পরিষ্কার থাক্‌লে, আর বায়ুপ্রবাহ না থাক্‌লে

শিশির পড়ে। আবার যে সব অঞ্চলে বস্তু বা যে সব বস্তু তাড়াতাড়ি তাপ বিকিরণ করে ঠাণ্ডা হয়, সেই সব অঞ্চলে বা সেই সব বস্তুর উপর শিশির বেশী পড়ে।

কুয়াশা

শীতকালে কুয়াশার অভিজ্ঞতা আমাদের সকলের আছে। ধোঁয়ার মত একটা জিনিস সমস্ত গাছপালা বা ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। এটা শীতকালেই হয়।

রাতে যদি বায়ুপ্রবাহ না থাকে তাহ'লে অনেক সময় ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বাতাস ওপরের বাতাসের চেয়ে এত বেশী ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় যে ঐ বাতাসের সম্পূর্ণটা প্রায় জলীয় বাষ্পে সংপৃক্ত হ'য়ে পড়ে। এই অবস্থায় বাতাসের জলীয় বাষ্প জমে সূক্ষ্ম সব জল বিন্দুতে পরিণত হয়। আর এই জলবিন্দু বাতাসে ভেসে বেড়াতে থাকে। আসলে ধোঁয়ার মত দেখ্‌তে হ'লেও এগুলো সব জল-বিন্দু। একেই আমরা বলি **কুয়াশা**।

প্রশ্নাবলী

(1) বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? ভূপৃষ্ঠের উপরে যে বিভিন্ন বায়ুস্তর আছে তার বিবরণ দাও।

(2) বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(3) প্রাণী যে বায়ু ছাড়া শ্বাসকার্য চালাতে পারে না, তা পরীক্ষার সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

(4) বায়ুর উপাদান বলতে কি বোঝ? বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প আছে তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ কর।

(5) আবহাওয়া বলতে কি বোঝ? কি কি জিনিসের ওপর আবহাওয়া নির্ভর করে?

(6) বায়ুর আর্দ্রতা বলতে কি বোঝায় তা পরিষ্কার করে লেখ।

(7) শিশির কিভাবে হয়? তাহার বর্ণনা দাও।

(8) কুয়াশার সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

(9) শূন্য স্থান পূরণ কর :—

(i) যে স্বচ্ছ গ্যাসীয় পদার্থ ভূপৃষ্ঠের চারদিকে ছড়িয়ে আছে তাকে বলে……।

(ii) ভূপৃষ্ঠ থেকে……মাইল ওপর পর্যন্ত বায়ুস্তর বিস্তৃত।

(iii) বায়ুমণ্ডলের ক্রমশঃ নীচের বায়ুস্তরগুলো……।

(iv) বায়ু একটা……পদার্থ।

(v) বায়ুর মধ্যের……সাহায্যে প্রাণী শ্বাসকার্য চালায়।

(vi) আবহাওয়া নির্ভর করে, বায়ুর……ও……উপর।

(vii) শীতকালে……ঠাণ্ডা হ'য়ে……পরিণত হয়। এই……বাতাসে ভেসে বেড়ায়। একে বলে……

(10) ঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও :—

প্রশ্ন	উত্তর
(a) প্রাণীর শ্বাসকার্যের জন্য যে গ্যাসের প্রয়োজন হয় তার নাম কি?	নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বনডাই অক্সাইড, জলীয় বাষ্প
(b) বায়ু কি ধরনের পদার্থ?	মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ, মৌলিক পদার্থ,
(c) বায়ুর আদ্রতা কিসের উপর নির্ভর করে?	চাপ জলীয় বাষ্প, উত্তাপ

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

মেঘ ও বৃষ্টি

সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ প্রথম উত্তপ্ত হয়। এই উত্তপ্ততার ফলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুও ক্রমশঃ গরম হ'তে থাকে। ফলে ওপরের দিকের বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। এ ছাড়া আমাদের জানা আছে যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই বাতাসের চাপও কমতে থাকে। এখন ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ু প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প নিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। যতই তা ওপরে যায় ততই ঠাণ্ডা হয়। আর এই ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে তার জলীয় বাষ্প ধারণের



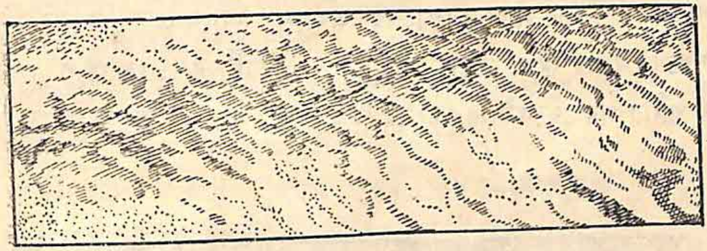
৬নং চিত্র—বৃষ্টির দৃশ্য

ক্ষমতাও কমে যায়। অতিরিক্ত জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় ঘনীভূত হ'য়ে কুয়াশার মত সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণাগুলো এক সংগে দল বেঁধে আকাশে ভেসে বেড়াতে থাকে। একেই আমরা বলি মেঘ। তাহ'লে ভূপৃষ্ঠের অনেক ওপরে যে কুয়াশার সৃষ্টি হ'চ্ছে তাকেই আমরা সাধারণভাবে বল্‌ছি মেঘ। এই মেঘ যখন আরো

ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন এর ছোট ছোট জলকণাগুলো বড় আর ভারী হ'তে থাকে। এই ভারী হাওয়ার ফলে এগুলো আর বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে না, অভিকর্ষের ফলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, তখন একে আমরা বলি **বৃষ্টি**।

মেঘের শ্রেণী বিভাগ: আকাশে নানা রঙের মেঘ দেখা যায়। শুধু রঙের বাহার নয় গঠন আর কার্যকারিতার দিক থেকে মেঘকে আমরা কয়েকটা বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন—

(১) অলক মেঘ—অনেক সময় আকাশে অনেক উঁচুতে পেঁজা

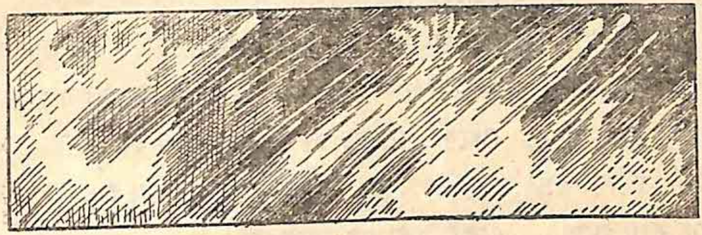


৭নং চিত্র—অলক মেঘ

তুলোর মত সাদা সাদা মেঘ দেখা যায়। একে বলে অলক মেঘ। এ ধরনের মেঘ খুব ভোরে অথবা সন্ধ্যার পর দেখা যায়। এই রকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না।

(২) স্তর মেঘ—প্রায় দিন সন্ধ্যার পর যদি আকাশের দিকে বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা যায় তাহ'লে দেখা যাবে অনেক দূরে আকাশে এক ধরনের মেঘ স্তরে স্তরে সাজানো আছে। এই মেঘকে বলে

জলদ বা বাদল মেঘ—বর্ষাকালে যে ধূসর রঙের মেঘ সারা আকাশ ছেয়ে থাকে তাকেই বলা হয় জলদ বা বাদল মেঘ। এই মেঘ থেকে



১০নং চিত্র—জলদ মেঘ

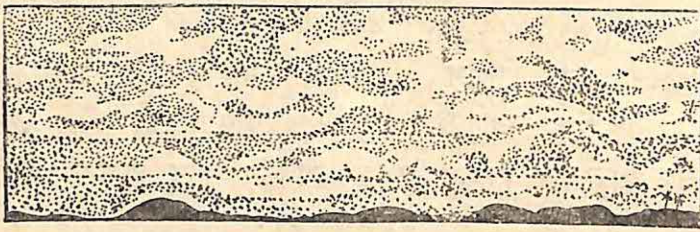
প্রচুর বৃষ্টি হয় বলে এর নাম এই দেওয়া হ'য়েছে। এই মেঘ মাটি থেকে এক মাইলের মধ্যেই থাকে।

এই প্রত্যেক ধরনের মেঘই আমরা আকাশে দেখ্‌তে পারি। এর জন্য বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দরকার হয় না।

বৃষ্টির শ্রেণী বিভাগ : পূর্বে আমরা সাধারণভাবে বৃষ্টি কি করে হয় তা আলোচনা করেছি। কিন্তু সাধারণ নিয়ম এক হ'লেও এক এক জায়গায় বৃষ্টি এক এক কারণে হয়। তাই এই বৃষ্টিপাতের কারণ অনুযায়ী বৃষ্টিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। যেমন—

(১) **পরিচলন বৃষ্টি**—নিরক্ষ রেখার আশেপাশের জলভাগ থেকে প্রচুর জলীর বাষ্প ওপরে উঠে। ঐ বাষ্প ওপরে গিয়ে মেঘের সৃষ্টি করে আর তার থেকে বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির এই সাধারণ কারণের কথা আমরা আগেই বলেছি। এই ধরণের বৃষ্টিপাতকে বলা হয় পরিচলন বৃষ্টি।

স্তর মেঘ। এই মেঘ ঘনীভূত হ'লে অনেক সময় মাঝরাতে বৃষ্টিপাত হয়।



৮নং চিত্র—স্তর মেঘ

(৩) স্তূপ মেঘ—সব ঋতুর মধ্যে শরতের আকাশই সব থেকে সুন্দর। শরতের নীল আকাশের এখানে ওখানে এক ধরনের সাদা ধব্‌ধবে মেঘের স্তূপ ভেসে বেড়ায়। এদেরই বলা হয় স্তূপ মেঘ। সূর্য ওঠার পর থেকেই এ ধরনের মেঘ দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠ থেকে এ



৯নং চিত্র—স্তূপ মেঘ

মেঘ অনেক দূরে থাকে না। এই মেঘ থেকে বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।

(২) **শিলাবৃষ্টি**—শিলাবৃষ্টি দেখার অভিজ্ঞতা আমাদের সবাইয়েরই আছে। কিন্তু কোথা থেকে আসে এই বরফের ঢেলা ? পাহাড়-চূড়া থেকে কি কেউ ছিটিয়ে দেয় ? না, তবে ?

মেঘ থেকে বৃষ্টিকণাগুলো ভূপৃষ্ঠে নামার সময় যদি কোন উর্ধ্বমুখী বায়ুর সাহায্যে আরো ওপরে উঠে যায় তাহ'লে ঐ জলকণাগুলো আরো ঠাণ্ডা হ'য়ে বরফে পরিণত হয়। একে বলা হয় শিলা। এই শিলা ভারি হওয়ায় বৃষ্টির সংগে বা অনেক সময় শুধু শুধুই পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। একেই বলা হয় শিলাবৃষ্টি।

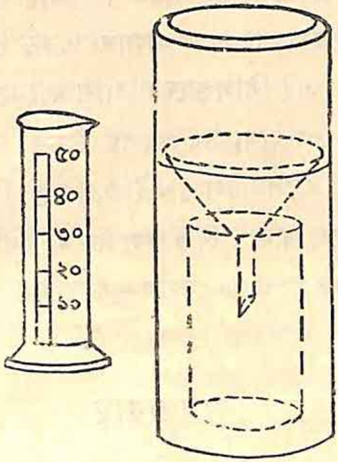
(৩) **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি**—অনেক সময় প্রচুর জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু উঁচু পাহাড় বা পর্বতের গায়ে বাধা পায়। এর ফলে ঐ বায়ু পাহাড় বা পর্বতের একদিকে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। একে বলে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি। আমাদের দেশে হিমালয় আর পশ্চিমঘাট পার্বত্য অঞ্চলে এই ধরনের বৃষ্টি হয়।

(৪) **তুষারপাত**—একেও আমরা এক ধরনের বৃষ্টি ব'লতে পারি। শীতপ্রধান দেশে শীতকালে বায়ুর জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডায় সরাসরিভাবে বরফে পরিণত হ'য়ে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। একে বলা হয় তুষারপাত। গাছপালা, ঘরবাড়ী, রাস্তা, সব জায়গায় বরফের আস্তরণ পড়ে যায়।

মেঘ ও বৃষ্টি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা : মেঘ সৃষ্টির কারণ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবীর বুকের নদী-নালা-পুকুর-হ্রদ-সমুদ্র প্রভৃতির জল সূর্যের তাপে বাষ্পে পরিণত হ'চ্ছে। সেই জলীয় বাষ্প আকাশের বুকে ঘোরাফেরা করতে করতে আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর বুকে আসছে। বৈশাখে শুকিয়ে যাওয়া সব নদী-নালাকে আবার জলে ভরে তুলছে। উদ্ভিদকুল প্রাণীকুল সবাই হাঁপ ছেড়ে

বাঁচ্ছে। যুগ যুগ ধরে জলীয় বাষ্পের এই নৈসর্গিক চক্র জীবের প্রাণ-স্পন্দনকে নতুনভাবে জাগ্রত কর্ছে।

বৃষ্টি মাপবার যন্ত্র: লোককে ব'ল্তে শোনা যায় "আজকে এক



১১নং চিত্র—বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র

ইঞ্চি বৃষ্টি হ'য়েছে বা "গতকাল আড়াই ইঞ্চি বৃষ্টি হ'য়েছে।" এই বৃষ্টির পরিমাণ কি করে মাপা হয়?

মাঠের জল দেখে? পুকুরের জল দেখে? নদীর জল দেখে? না, এদের কোনটি দেখে বৃষ্টি মাপা হয় না। বৃষ্টি মাপবার জন্য এক বিশেষ যন্ত্রের ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের গঠন এমন কিছু শক্ত নয়; খুবই সাধারণ। ৫ থেকে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ফানেলকে ঠিক ঐ একই ব্যাসের একটা বোতলের উপর লাগানো হয়। ঐ বোতলের তলায় ইঞ্চির দাগ কাটা থাকে। এখন এই ফানেল সমেত বোতলটি আর একটি টিনের পাত্রের মধ্যে রেখে বৃষ্টিতে রাখা হয়। যখন বৃষ্টি

হ'তে থাকে তখন বৃষ্টির জল ফানেলের মধ্য দিয়ে গিয়ে বোতলে জমা হ'তে থাকে। বোতলের গায়ের দাগ থেকে বোঝা যায় কত ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হ'ল।

অনেক সময় আবার বৃষ্টি পরিমাপ করার যন্ত্রের বোতলে দাগ থাকে না। এই পরিমাপের জন্য আলাদা একটি দাগ কাটা সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। এই সিলিণ্ডারের ব্যাস ফানেলের ব্যাসের চেয়ে যত গুণ ছোট হবে, এর মধ্যেকার জলের উচ্চতা তত বেশী বাড়বে। যেমন ধর, ফানেলের ব্যাস ছিল ১০ ইঞ্চি, কিন্তু সিলিণ্ডারের ব্যাস ২ ইঞ্চি তাহ'লে বোতলে যদি ১ ইঞ্চি জল জমে সেই জল সিলিণ্ডারে হবে ১০ ইঞ্চি। সুতরাং এতে দেখার খুব সুবিধা হয়।

বায়ু প্রবাহ

আমরা জানি বায়ু সর্বত্রই আছে। তবে স্থির আছে কি ? না, নড়াচড়া সব সময়েই করছে। এক জায়গা থেকে বায়ু অন্য জায়গায় যাচ্ছে। একেই বলা হয় বায়ুপ্রবাহ। যখন এই বায়ুপ্রবাহ খুব জোর হয় তখনই আমরা বুঝ্‌তে পারি। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগ্‌তে পারে পৃথিবীর সব জায়গায় যখন বায়ু আছে তখন তাদের নড়াচড়া করার প্রয়োজন কি ? তারা তো একই জায়গায় থাক্‌তে পারে। কেন এই বায়ুপ্রবাহ হয় বুঝ্‌তে গেলে প্রথমে এই তিন্‌টে জিনিস মনে রাখ্‌তে হবে।

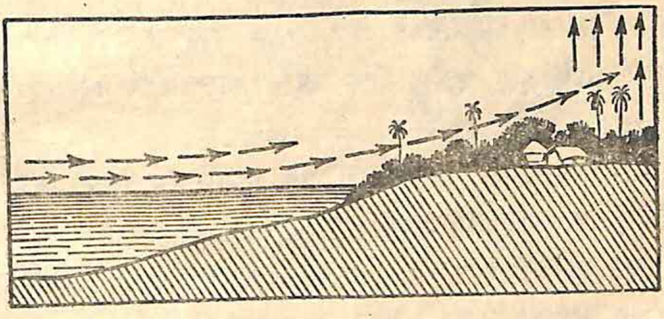
(১) বাতাস গরম হ'লে তা প্রসারিত হয়। ফলে বাতাস হালকাও হয়। তখন ঐ বাতাস তার উপরের স্তরের বাতাস অপেক্ষা হালকা হ'য়ে যায় ব'লে ওপরে উঠে যায়।

(২) জলীয় বাষ্প বাতাসের থেকে হাল্কা। সুতরাং গরম বাতাসের সংগে যদি জলীয় বাষ্প থাকে তাহ'লে তা আরও হাল্কা হয়। ফলে তার পক্ষে ওপরে ওঠা আরও সহজ হয়।

(৩) হালকা বায়ু যখন ওপরে উঠে যায় তখন সেই জায়গার চাপ কমে যায়। ফলে আশেপাশের অপেক্ষাকৃত শীতল জায়গার বায়ু সেখানে এসে সেই জায়গা পূর্ণ করে।

এই যে আশপাশের বায়ু ছুটে আসছে এর ফলেই বায়ুপ্রবাহ হয়। যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি বাতাস বইছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন জায়গার বায়ুপ্রবাহ নির্ভর করছে সেখানকার বায়ুর উষ্ণতা আর তার সংগে মিশ্রিত জলীয় বাষ্পের পরিমাণের ওপর।

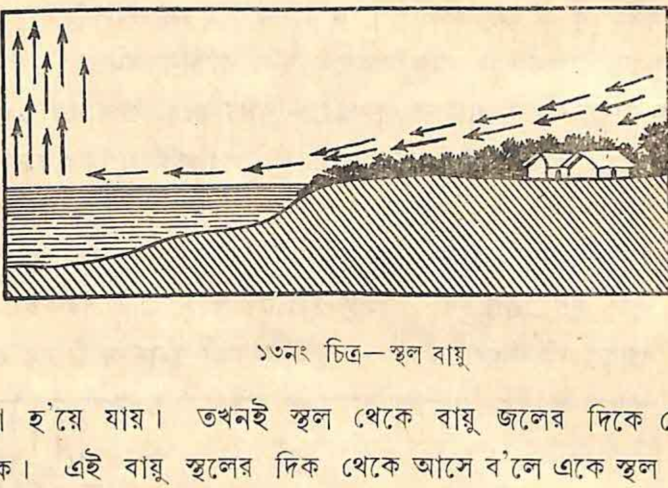
বায়ুপ্রবাহের দিক থেকে বায়ুকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ (১) **সমুদ্র বায়ু** ও (২) **স্থল বায়ু**। দিনের বেলা সূর্যকিরণে জল স্থল দুই উত্তপ্ত হয়। কিন্তু স্থল যত তাড়াতাড়ি গরম হয় জল অত তাড়াতাড়ি গরম হয় না সমুদ্রতীরবর্তী স্থলভাগ দিনের বেলা



১২নং চিত্র—সমুদ্র বায়ু

জলভাগের চেয়ে বেশী গরম হয়। ফলে স্থলভাগের উপরের বায়ুও তাড়াতাড়ি গরম হয় এবং হাল্‌কা হ'য়ে ওপরে ওঠে। এখানের

চাপ কমে যায়। এই সময় সমুদ্রের ওপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু স্থলের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু সমুদ্রের দিক থেকে আসে ব'লে একে বলে সমুদ্র বায়ু। আবার সন্ধ্যাবেলা ঠিক এর উল্টো হয়। স্থলভাগ গরম হয় যত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডাও হয় জলের থেকে অনেক তাড়াতাড়ি। জলভাগ গরম হয় দেরীতে আর ঠাণ্ডাও হয় দেরীতে। সন্ধ্যার পর জল যখন গরম থাকে স্থল তখন

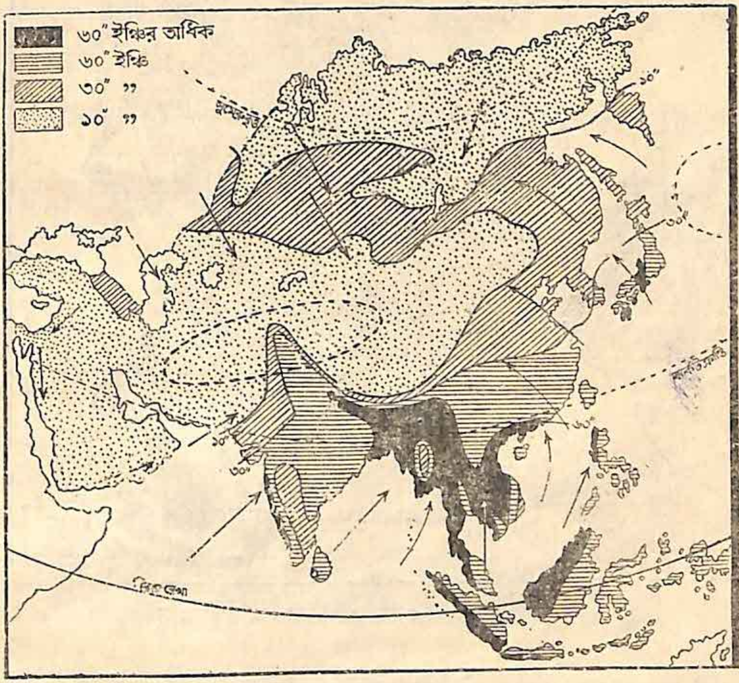


১৩নং চিত্র—স্থল বায়ু

ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। তখনই স্থল থেকে বায়ু জলের দিকে যেতে থাকে। এই বায়ু স্থলের দিক থেকে আসে ব'লে একে স্থল বায়ু বলা হয়।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে সূর্য খাড়াভাবে কিরণ দেয় এবং বেশীর ভাগ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অংশের ওপরেই থাকে। ফলে এই সময় স্থলভাগের ওপরের বায়ু খুব বেশী উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে কিন্তু এর দক্ষিণের সমুদ্রের ওপরের বায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে। এই কারণে সমুদ্রের দিক থেকে বাতাস স্থলভাগের দিকে আসে। এই বাতাস সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসে বলে সংগে প্রচুর জলকণা থাকে, ফলে এই বায়ুর প্রভাবে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাত হয়। যে সময়

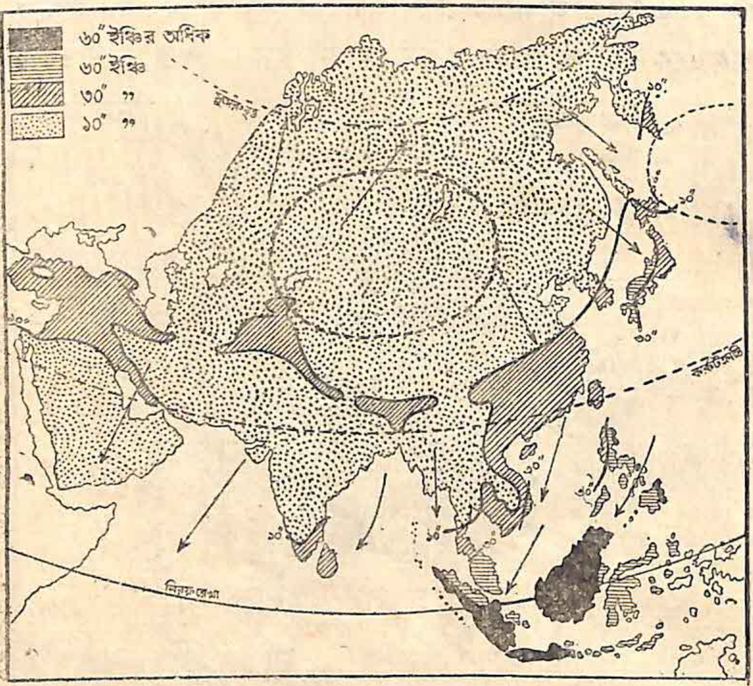
এই বায়ু বয় তাকে আমরা বলি বর্ষাকাল। এই বায়ুকে বলা হয় মৌসুমী বায়ু। মৌসুমী কথাটা আরবীয়, আর এর মানে সাময়িক বা ঋতু। এই বায়ু আমাদের দেশে আসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। তাই একে বলা হয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। আবার শীতকালে



১৪নং চিত্র—গ্রীষ্মকালে এশিয়ার মৌসুমী বায়ু

সূর্য যখন আরও দক্ষিণে সরে যায় তখন এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে সমুদ্রের ওপর হয় তার অবস্থান। এই সময় সমুদ্রের ওপরকার বায়ু স্থলের বায়ু অপেক্ষা উত্তপ্ত থাকে। এর ফলে স্থল থেকে বায়ু জলের দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যায়।

এই বায়ু আমাদের দেশে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়। একে বলা হয় উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ু। এই বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ



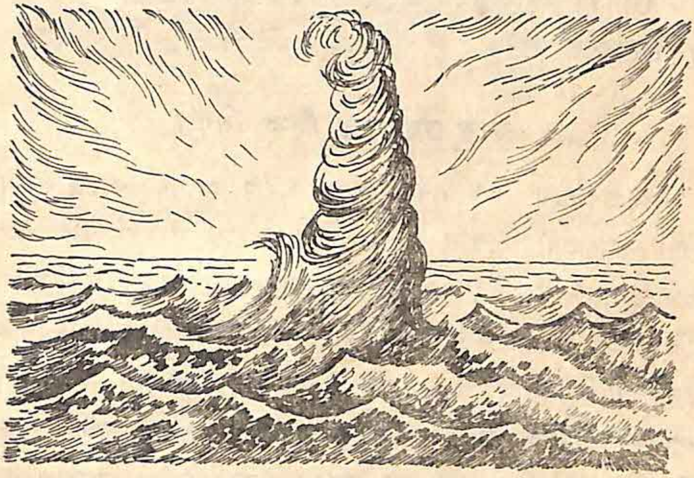
১৫নং চিত্র—শীতকালে এশিয়ার মৌসুমী বায়ু

খুবই কম থাকে, কারণ এই বায়ু মূলতঃ স্থলভাগের ওপর দিক থেকেই বয়ে আসে। সেজন্য এতে বৃষ্টিপাত হয় না। শুধু বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে বয়ে আসার সময় কিছু জলীয় বাষ্প এনে পূর্বঘাট পর্বতের কাছাকাছি কিছু বৃষ্টিপাত ঘটায়।

এই তো গেল সাধারণ অবস্থায় বায়ুপ্রবাহের কথা। কিন্তু এই বায়ুপ্রবাহ অনেক সময় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। গাছপালা

ঘরবাড়ি যা পায় ভেঙে দিয়ে চলে যায়। এর নির্দিষ্ট কোন দিক থাকে না। একে বলা হয় ঝড়। গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে যখন মাটি, বালু অত্যন্ত গরম হ'য়ে যায়; যখন সেখানকার বাতাস উপরে ওঠে যায় তখন আশপাশের চারিদিকের শীতল বাতাস সেইদিকে ছুটে আসে। এই যে এলোপাতাড়ি বায়ুপ্রবাহ একে বলে ঝড়।

আবার খুব অল্প পরিসর স্থান যদি হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠে তাহ'লে



১৬নং চিত্র—জলস্তম্ভ

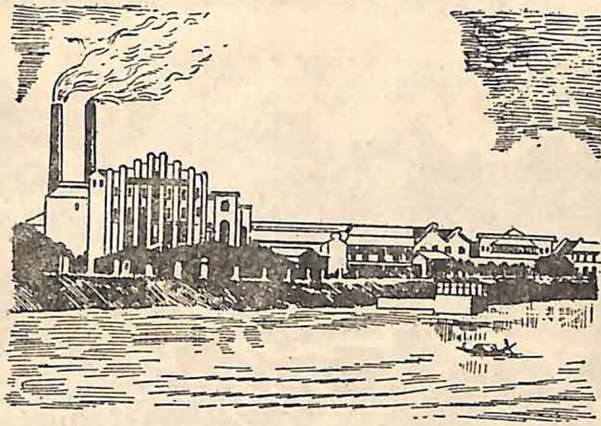
সেখানের বায়ুর চাপ খুব তাড়াতাড়ি কমে যায়। তখন পাশাপাশি সব শীতলবায়ু সেইদিকে ছুটে আসে। এই বায়ু ঘুরতে ঘুরতে ঐ কম চাপযুক্ত স্থানের কেন্দ্রে আসে এবং সেখান থেকে উপরে উঠে যায়। তোমরা হয়তো এই রকম জিনিস দেখে থাকবে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই একটা বাতাস গোল হ'য়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে পথের সব

আবর্জনা কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারপর এক জায়গায় এসে ধোঁয়ার মত উপরে উঠে যাচ্ছে, ধূলো-বালি-আবর্জনা সমেত। একে বলে **ঘূর্ণিবাত**। এই ঘূর্ণিবাতের শক্তি প্রচণ্ড। এর পথে বড় গাছ পড়লে তাকে এ একেবারে উপ্‌ড়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। এই বায়ু-প্রবাহে ঝড়ও হয় যেমন আবার অনেক সময় বৃষ্টিও হয়। এই তো গেল স্থলের কথা। এই ঘূর্ণিবাত যদি সমুদ্রের উপর দিয়ে যায় তাহ'লে কোন কোন জায়গার জল থামের মত উপরে উঠে যায়। একে বলা হয় **জলস্তম্ভ**। একই রকম ঘটনা মরুভূমির বুকে ঘট্‌লে হয় **বালুস্তরের সৃষ্টি**।

বায়ুপ্রবাহের দিক্ নির্ণয়

বায়ুপ্রবাহের দিক নির্ণয় ক'রে তাকে অনেক কাজে লাগানো যায়। বায়ুপ্রবাহ কোন্ দিক থেকে হ'চ্ছে তা বোঝার অনেক সহজ উপায় আছে। যেমন ধর, কাছাকাছি কোন যদি কারখানা থাকে তবে তার ধোঁয়া বেরুনোর চিম্‌নির দিকে তাকিয়ে দেখ তাহ'লে দেখবে ঐ ধোঁয়া যে কোন একটা দিকে বেঁকে যাচ্ছে। এই ধোঁয়ার দিক দেখে আমরা বায়ুপ্রবাহের দিক নির্ণয় করতে পারি। ধোঁয়া যদি দক্ষিণ দিকে যায় তাহ'লে বুঝ্‌বে উত্তর দিকের বাতাস আবার উত্তর দিকে গেলে বুঝ্‌বে দক্ষিণ দিকের বাতাস। অর্থাৎ ধোঁয়া যে-দিকে যাবে বায়ুপ্রবাহ তার উল্টো দিক থেকে হ'চ্ছে। এছাড়া ঘরের ওপরে যদি পতাকা থাকে তার দিক দেখেও ঐভাবে বায়ুপ্রবাহের দিক নির্ণয় করা যায়। বাত-পতাকা দিয়ে বায়ু-প্রবাহের দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এতে চারটে প্রধান দিক অনুসারে চারটে বাহু থাকে। বাহুর গায়ে উ, দ, পূ, প লেখা

থাকে। এই বাহুগুলো একটা দণ্ডের সংগে স্থির থাকে। এর ওপরে একটা তীর এমনভাবে থাকে যেন বাতাসে সহজভাবে ঘুরতে



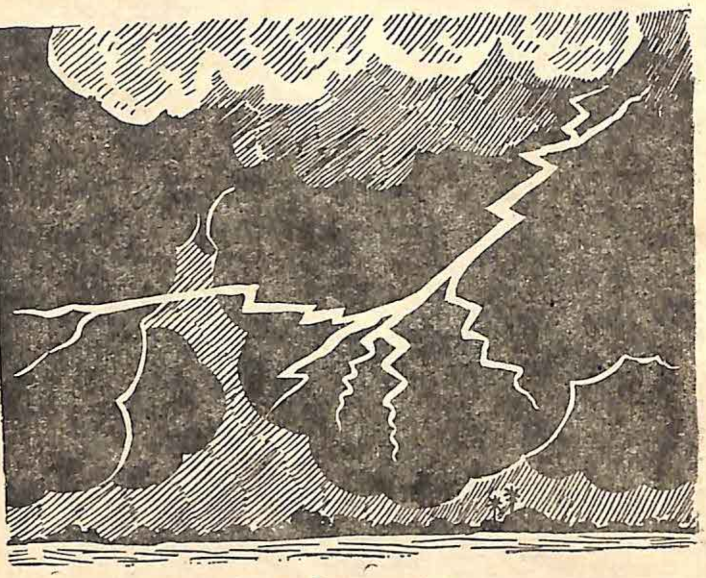
১৭নং চিত্র—চিম্‌নির ধোঁয়া দ্বারা বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয়

পারে। তীরের একদিকে থাকে ফলা, একদিকে থাকে পাখ্‌না। এখন বায়ুপ্রবাহ হ'লে ঐ তীরের ডগা যে দিক থেকে বায়ুপ্রবাহ হ'চ্ছে সেদিকে ঘুরে যায়। যদি উত্তর দিক থেকে বায়ুপ্রবাহ হয় তাহ'লে তীরের ফলা উত্তর দিকে থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুপ্রবাহ যে দিক থেকেই হউক খুব সহজে বোঝা যায়।

বজ্রপাত

তোমরা শুনে থাক বাজ প'ড়ে লোক মারা গেল; গাছ পুড়ে গেল, ঘর ফেটে গেল। এটা কি এমন এক অস্ত্র যা দিয়ে এইভাবে বিশাল গাছকে পুড়িয়ে দেওয়া যায়? বাজ পড়া ব'লতে কি পড়ে? পুরাকালের ধারণা বজ্র হ'ল ইন্দ্রের অস্ত্র। তিনি প্রয়োজন মত তা

নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাই কি হয়? শূন্যে বায়ুমণ্ডলে কি দেবতার রাজ্য আছে? এ সব প্রশ্ন আমরা এখানে আলোচনা করবো না। তবে এই বাজ বা ভালকথায় যাকে বজ্র বলে এটা কি? বেঞ্জামিন



১৮নং চিত্র—বজ্রপাত

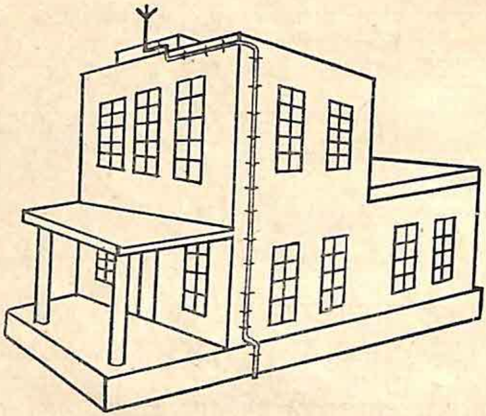
ফ্রাঙ্কলিন রেশমের সূতো দিয়ে ঝড়ের সময় ঘুড়ি উড়িয়ে তা দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি নামিয়ে আনলেন। তার থেকে বোঝা গেল আসলে আমরা যাকে এতদিন অস্ত্র বলছিলাম সেটা আর কিছু নয়, একটা বৈদ্যুতিক শক্তি আর ঝলকানি হ'ল বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ। কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তিই বা আকাশে গেল কি করে?

মেঘের জলকণাগুলো যখন বড় এবং ভারী হয় তখন তা উর্ধ্বমুখী বায়ুর মধ্য দিয়ে নীচের দিকে নেমে আসতে থাকে। এই সময় এই জলকণা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবার ছোট হ'তে থাকে এবং বায়ুর সংগে

সংঘর্ষের ফলে এতে ধনাত্মক বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। আবার অপর দিকে বায়ুকণাগুলো ঋণাত্মক বিদ্যুৎ ভাবাপন্ন হয়। এইভাবে জলকণা-গুলো যত নীচে নামতে থাকে ততই ভেঙ্গে ছোট হ'তে থাকে আর ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ বেড়ে যায়। এখন এই জলকণা ক্রমে ক্রমে এত ছোট হ'য়ে পড়ে যে তা আবার ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহে ওপরে উঠে যেতে থাকে। এই ক্ষুদ্র জলকণা ওপরের ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে এলে আরো জলকণা এসে পড়ে। ফলে আবার বড় হয় এবং নীচে নামতে থাকে। এইভাবে কয়েক বার ওঠা-নামা করতে করতে মেঘের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণও বেড়ে যায়। তখনই এই বিদ্যুতের পরিমাণ এত বেশী হয় যে তা এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে যায় বা পৃথিবীতে নেমে আসে। একে বলে বজ্রপাত। যে জায়গা দিয়ে বিদ্যুৎ-পরিবহণ হয় সেই জায়গায় বায়ু উত্তপ্ত হ'য়ে সরে যায়। ফলে আশেপাশের ঠাণ্ডা বায়ু প্রচণ্ড বেগে সেদিকে ছুটে আসে। এর ফলে একটা ভীষণ শব্দ হয়। একেই আমরা মেঘের গর্জন বলি।

এখন এই বিদ্যুৎ এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে বা পৃথিবীতে যায় কেন? বিদ্যুতের আর জলের ধর্ম একদিক দিয়ে এক। জল যেমন উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গায় যায়, বৈদ্যুতিক শক্তি তেমনি যেখানে বেশী পরিমাণ আছে সেখান থেকে কম পরিমাণের দিকে যায়। এখন এই দুই বস্তুর মধ্যে যদি ফাঁক থাকে এবং একদিকের বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ খুব বেশী হয় তাহ'লে ঐ শক্তি লাফিয়ে বেশী থেকে কমের দিকে যায়। এর ফলে আলোর একটা ঝলকানি হয়। এই ঝলকানিকে বলে বিদ্যুৎ। বায়ুস্তর যদিও কুপরিবাহী তবুও দুই বস্তুর মধ্যে যদি শক্তির তারতম্য বেশী হয় তাহ'লে বাতাসের মধ্যে দিয়ে

প্রবেশ করতে পারে। এই তড়িৎবাহী মেঘ যখন আবার পৃথিবীর বিপরীতধর্মী বিদ্যুতের সংগে আবেশ সৃষ্টি করে তখন মেঘ থেকে বিদ্যুৎ মাটিতে নেমে আসে। একে আমরা বলি বজ্রপাত। ভূপৃষ্ঠের যে জায়গায় আকর্ষণ হ'চ্ছে সেই জায়গার সব চেয়ে উঁচু জিনিসটার



১৯নং চিত্র—বজ্ররক্ষী

মধ্য দিয়ে বিদ্যুতপ্রবাহ হয়। সেই বস্তুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ মাটিতে গিয়ে পৌঁছায় এবং তার তাপের ফলে বস্তুটি পুড়ে যায়। এর ফলে গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদি তড়িৎহত হ'য়ে মারা যায়। এর ফলে উঁচু উঁচু বাড়ীও নষ্ট হ'তে পারে। সেইজন্য আজকাল বড় বড় বাড়ীতে বজ্ররক্ষী দেওয়া হয়। এটা একটা ধাতব দণ্ড। ছাদের উপরে উঁচু ক'রে দেওয়া থাকে। এর মুখে কতকগুলো ফলার মত থাকে। এর দণ্ডের অপর প্রান্তকে একেবারে সোজাসুজিভাবে মাটির সংগে যোগ করে দেওয়া হয়। দৈবাৎ যদি বজ্রপাত হয় তাহ'লে বিদ্যুৎ ঐ দণ্ড বেয়ে সোজা মাটিতে নেমে আসে। ফলে বাড়ীর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আবহাওয়ার পূর্বাভাষ

প্রতিদিন কাগজে একটা বিশেষ জায়গায় আবহাওয়ার খবর বেরোয়। প্রথম থাকে আগের দিনের আবহাওয়ার খবর, তারপর থাকে সেইদিনের পূর্বাভাষ। অর্থাৎ সেইদিন আবহাওয়া কেমন থাক্‌তে পারে। তোমরা দেখ্‌লে পৃথিবীর বুকে ঝড় বৃষ্টি তাপ ইত্যাদি সব কিছু নির্ভর কর্‌ছে বায়ুপ্রবাহ, তার চাপ আর সূর্যের অবস্থানের উপর। সুতরাং এই সব পর্য্যবেক্ষণ করে আবহাওয়া সম্বন্ধে আগে থেকে কিছু আন্দাজ করা যেতে পারে। আবার থার্মো-মিটার, বৃষ্টিমাপক যন্ত্র, বাত পতাকা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক খবর পাওয়া যায়। এর ফলে গত দিনের আবহাওয়ার কথা জানা যায়। এই আবহাওয়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্ব থেকে জান্‌লে কোন দুর্যোগের জন্য আগে থেকে প্রস্তুত হওয়া যায়। দৈনন্দিন এই যে আবহাওয়ার একটা তালিকা করা হয়, একে বলে আবহাওয়ার তালিকা। কোন জায়গার সারা বছরের সাধারণ আবহাওয়াকে বলে সেই স্থানের জলবায়ু।

এ ছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে এক রকম বিশেষ ধরনের আবহাওয়া বর্তমান থাকে। যেমন গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী হয়, আর বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়, শরৎকালে সাদা মেঘের দল ঘুরে বেড়ায়, ইত্যাদি। এই বিভিন্ন ঋতুর প্রত্যেক দিনের বৈশিষ্ট্য একটা তালিকার মধ্যে যদি রাখা যায় তাহ'লে তার থেকে সারা বছরের আবহাওয়া সম্বন্ধে একটা বেশ ধারণা পাওয়া যায় এই তালিকাকে বলা হয় ঋতুর আবহাওয়া চিত্র। এইভাবে তোমরা যদি বিভিন্ন ঋতুর আবহাওয়া চিত্র আঁকতে পার, তাহ'লে দেখ্‌তে পাবে কি সুন্দর এই পৃথিবী! কি সুন্দর তার নিয়ম শৃঙ্খলা!

প্রশ্নাবলী

(1) মেঘ সৃষ্টির কারণ কি ? বিভিন্ন ধরনের মেঘের বিবরণ দাও।

(2) বৃষ্টিপাতের কারণ কি ? বৃষ্টির শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাদের সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(3) বজ্রপাতের কারণ কি ? বজ্রপাতের সময় শব্দ হয় কেন ? বজ্রপাতের হাত থেকে বাড়ীকে রক্ষা করার জন্য কি করা হয় ?

(4) বায়ুপ্রবাহ কেন হয় ? কিভাবে বায়ুপ্রবাহ হয় ছবির সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

(5) বৃষ্টি পরিমাপের পদ্ধতি ও যন্ত্রের বিবরণ দাও।

(6) সমুদ্র ও স্থল বায়ু কাকে বলে ? তাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(7) মৌসুমী বায়ু কাকে বলে ? দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার মৌসুমী বায়ু সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(8) আবহানয়ার পূর্বাভাষ বল্‌তে কি বোঝ ? কি কি জিনিসের উপর ভিত্তি করে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ লেখা হয় ?

(9) শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(a) …………মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয়। (b) ……মেঘে বৃষ্টি হয় না।

(c) শরতের আকশে সাধারণতঃ যে মেঘ দেখা যায় তাকে বলে……।

(d) যখন মেঘের…………বিদ্যুৎ পৃথিবীর বুকে নেমে আসে তা'কে বলে বজ্রপাত।

(e) সমুদ্রের পাশাপাশি অঞ্চলে দিনের বেলা যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে………………, আর সন্ধ্যার পর যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে বলে………।

(f) কোন স্থানের সাধারণ আবহাওয়াকে বলে……।

(10) ঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও।

প্রশ্ন	উত্তর
(i) মেঘ কি ?	কলকারখানার ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প, জলকণা।
(ii) বায়ুপ্রবাহের দিক, যে যন্ত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা হয় তার নাম কি ?	হাইগ্রোমিটার, বাত পতাকা, বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র।
(iii) বজ্রপাতের সময় মেঘ হইতে পৃথিবীতে কি নেমে আসে ?	অভ্র, লোহার খণ্ড, তড়িৎ-শক্তি।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

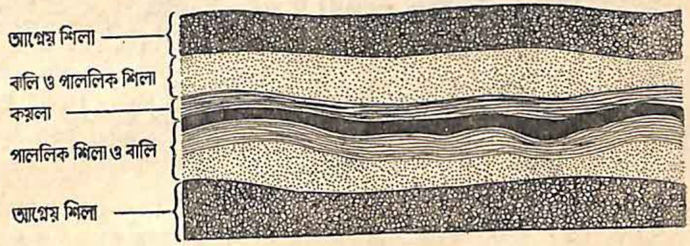
খনি ও খনিজ

সাধারণ অর্থে আমরা বুঝি—খনি থেকে যা পাওয়া যায় তাই হ'ল খনিজ। অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে খনি থেকে যা বের করতে হয় তাহ'ল খনিজ বস্তু। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অর্থে খনিজ শব্দ আরো বিস্তৃত। স্বভাবজ যে কোন অজৈব বস্তুকে তাঁরা খনিজ বলেন। আর তা যেখানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তাই হ'ল খনি। সে ভূপৃষ্ঠের উপরেও হ'তে পারে বা তলায়ও হ'তে পারে। যেমন মারবেল, শ্লেট, লোহার আকর ভূপৃষ্ঠের উপরেই পাওয়া যায়; আবার কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি মাটির তলায় পাওয়া যায়। এরা প্রত্যেকেই খনিজ। এই অর্থে জলও খনিজ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য্য প্রায় প্রত্যেক জিনিসই পৃথিবীর বুকে প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে কয়লা ও লোহার খনি বাংলা দেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি জায়গায় আছে। আসামে পেট্রোলিয়ামের খনি আছে। এ ছাড়া অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ আমাদের দেশে প্রচুর আছে। যে আকার থেকে অ্যালুমিনিয়াম তৈরী হয়, অর্থাৎ বক্সাইট, তাও আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়। সোনার খনি শুধুমাত্র মহীশূরে আছে। তামা, রূপা, সীসা ইত্যাদির খনিও আমাদের দেশে খুব কম।

কয়লা

খনিজের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হ'ল কয়লা। কালো কুৎসিত পাথর। হাজার হাজার বছর ধরে মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকায় গাছপালা, চাপ ও অন্যান্য রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এই ধরনের পলল পাথরে পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, আজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যখন মানুষেরই জন্ম হয়নি তখন সমস্ত ভূপৃষ্ঠ গাছপালায় ভর্তি ছিল। ভূমিকম্প বা কোন রকম নৈসর্গিক আলোড়নের ফলে পৃথিবীর কোন কোন জায়গা বসে যায়। জায়গায়

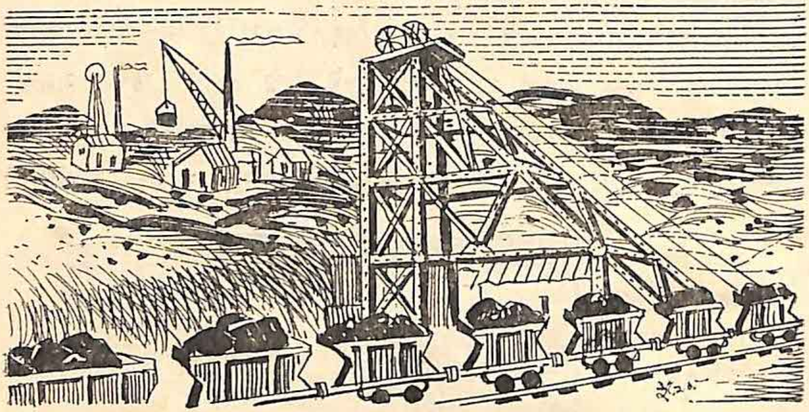


২০নং চিত্র—মাটির নীচে কয়লার স্তর

জায়গায় ভূপৃষ্ঠের বিরাট বিরাট অংশ ঐ সব গাছপালা সমেত মাটির নীচে চলে যায়। এর উপর বালি, পলিমাটি ইত্যাদি স্তরে স্তরে জমতে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে। সেই সংগে এই সব উদ্ভিদগুলো কয়লায় পরিণত হয়। মাটির নীচে কয়লা স্তরে স্তরে সাজানো থাকে।

কিন্তু এই কয়লাকে মাটির নীচ থেকে উপরে ওঠানো খুব সহজ কাজ নয়। প্রথমে কাদা মাটি তারপর পলল শিলার স্তর খুঁড়ে তবে কয়লার স্তর পাওয়া যায়। খনিতে যারা কাজ করে তারা মাটির

নীচে ঢুকে কয়লা কাটে। কিন্তু এই কয়লা খুব সাবধানে কাট্‌তে হয়। মাঝে মাঝে থামের মত রেখে কাট্‌তে হয় তা না-হ'লে উপরের মাটির ভার সামলাতে পারে না। কয়লার খনির ভেতর নানা রকম দূষিত গ্যাস জন্মে, এর ফলে দুর্ঘটনাও প্রচুর হয়।



২১নং চিত্র—মাটির তলা থেকে কয়লা তুলে কারখানায় পাঠান হচ্ছে

কয়লা কাটা হ'লে কপি কলের সাহায্যে একে উপরে উঠানো হয়। আবার অনেক সময় খনির খালি জায়গা ভর্তি করার জন্য বালি দেওয়া হয়।

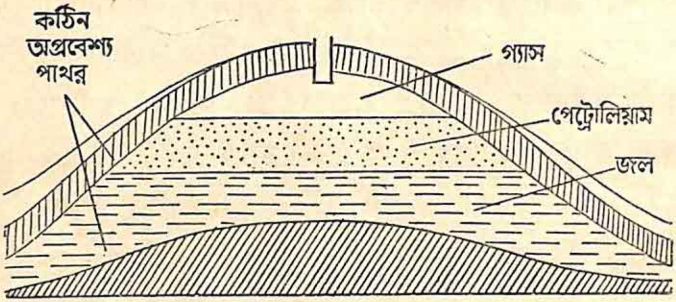
লক্ষ লক্ষ কুলি জীবন বিপন্ন করে খনির ভেতর কাজ করে। তাদের মেহনত আর প্রকৃতির দান দুই মিলে আমরা সভ্যতার এই প্রয়োজনীয় চাবি কাঠিকে পেয়েছি। কয়লা যে শুধুমাত্র জ্বালানীর কাজে ব্যবহার হয় তা নয়, কয়লা থেকে আরো অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পাই। খনি থেকে যে কয়লা পাওয়া যায় তাকে একেবারে উনুনে দিয়ে জ্বালানো যায় না, ওকে পোড়াতে

হয়। লোহার বদ্ধ পাত্রে পোড়ালে কয়লা থেকে জ্বালানী গ্যাস, আলকাতরা, অ্যামোনিয়া, স্যাকারিন ইত্যাদি পাওয়া যায়। বাকী যে অংশটা পড়ে থাকে সেটাকে জ্বালানীর জন্য ব্যবহার করা যায়। কয়লাকে এইভাবে শোধনের জন্য পশ্চিম বাংলায় দুর্গাপুরে এক কারখানা আছে—'দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যাণ্ট'।

পেট্রোলিয়াম

সাধারণতঃ মোটর গাড়ীতে যে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করা হয় তাকে ঠিক পেট্রোলিয়াম বলে না। ওটা যদিও খনিজ পেট্রোলিয়ামকে শোধন করে পাওয়া যায়। মাটির নীচে শিলা-স্তরে যে তেল পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় পেট্রোলিয়াম। প্রচলিত পেট্রোলিয়াম থেকে তার তফাৎ অনেক। বিজ্ঞানীদের মতে প্রাচীন উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দেহাবশেষ থেকেই এই তেলের সৃষ্টি হ'য়েছে। যদি উৎপত্তি স্থলের ওপরে ও নীচে অপ্রবেশ্য শিলাস্তর থাকে তাহ'লে তেল সেইখানে আটকা পড়ে। আবার অনেক সময় শিলাস্তরের ফাটল দিয়ে বা প্রবেশ্য শিলার মধ্য দিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে জমা হয়। এই তেলের সংগে প্রচুর গ্যাস থাকে, ফলে সেই গ্যাসের চাপে সমস্ত ভূত্বকের স্তর ধনুকের মত বেঁকে যায়। যে জায়গায় তেল আছে সেখানে নলকূপ বসালে, তার জল যদি ঐ তেলের স্তরে গিয়ে কোন রকমে পৌঁছে যায় তাহ'লে ওর ভেতর দিয়ে সজোরে গ্যাস আর তেল বেরুতে থাকে।

ঠিক নলকূপের মত নল ঢুকিয়েই মাটির নীচের তেল ঠিক ঐ



২২নং চিত্র—মৃত্তিকার নীচে শিলা স্তরে তৈলের উৎস

ভাবে বের করতে হয়। তেল মাটির ভেতরে অনেক নীচে থাকে বলে একে তোলার জন্য ৩০০ থেকে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত নল বসাতে হ'তে পারে। ভারতে আসাম অঞ্চলে বেশী পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। মাটির নীচ থেকে এই তেলকে তুলে উত্তাপের সাহায্যে শোধন করতে হয়। এর থেকে বহু রকম নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস পাওয়া যায়—তার মধ্যে পেট্রল, কেরোসিন, ডিজেল, বেনজাইন প্রধান। এই সব জিনিস আমাদের দৈনন্দিন অনেক চাহিদা মেটায়।



পাম্পের দ্বারা তৈল উত্তোলন

লোহা

এমনি সাধারণ অবস্থায় লোহা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেক খনিজ পাথর পাওয়া যায় যাতে লোহার পরিমাণ খুবই বেশী থাকে। এইসব পাথর লোহা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের যোগে সৃষ্টি। ভারতবর্ষে যে সব লোহা পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তার নাম হ'ল রেড হিমাটাইট বা ম্যাগনেটাইট। মহীশূর, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি অঞ্চলে এইসব পাথর পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। পশ্চিম বাংলার কিছু কিছু জায়গায় এই পাথর অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

এই লোহা পাথরকে শোধন করে তার থেকে ধাতব লোহা পাওয়া যায়। এই শোধনের জন্য বিশেষ এক চুল্লী ব্যবহার করা হয় তাকে বলে মারুত চুল্লী বা ব্লাষ্ট ফারনেস। লোহার পাথরকে গুঁড়ো করে কয়লা, আর সামান্য পরিমাণ চুণা পাথরের সংগে মিশিয়ে মারুত চুল্লীতে উত্তপ্ত করা হয়। এর ফলে চুন খনিজের ভেতরকার অন্যান্য আবর্জনার সংগে মিশে ধাতুমলের সৃষ্টি করে আর ধাতব লোহা তরল অবস্থায় আলাদা হ'য়ে যায়। ঐ ধাতুমল তরল লোহার উপর ভাস্‌তে থাকে। চুল্লীর আলাদা আলাদা ছিদ্রপথ দিয়ে এদের বের করা হয়। এর থেকে যে লোহা পাওয়া যায় তাকে বলে ঢালাই লোহা বা 'কাষ্ট আয়রণ'। এর গলনাঙ্ক কম ; মাত্র ১২০০° সেন্টিগ্রেড। তাই একে সহজে গলিয়ে কড়াই, পাইপ, রেলিং ইত্যাদি করা যায়। এই লোহা ভঙ্গুর তাই একে পিটিয়ে কিছু জিনিস করা যায় না। এই লোহার শতকরা ২·২ থেকে ৪·৫ ভাগ কার্বন থাকে। এই লোহাকে আরো বিশুদ্ধ করলে যে লোহা পাওয়া

যায় তাকে বলে পেটাই লোহা বা রট আয়রণ। এই জাতীয় লোহাকে পিটিয়ে দা, খুন্‌তি, বঁটি ইত্যাদি করা যায়। এতে



২৩নং চিত্র—মারুত চুল্লী বা ব্লাষ্ট ফারনেস

শতকরা ·১৫ থেকে ·২৫ ভাগ কার্বন থাকে। এর গলনাঙ্ক হ'ল ১৫০০° সেন্টিগ্রেড ; এ লোহা খুব নরম হয়।

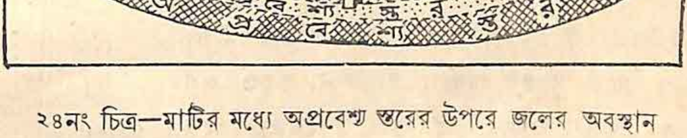
এছাড়া সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও মজবুত যন্ত্রপাতি তৈরী করার জন্য এক জাতীয় লোহা ব্যবহার করা হয় তাকে বলে ইস্পাত বা 'ষ্টীল'। এটা অন্য কোন ধাতু নয়। ঢালাই লোহার কার্বনের ভাগ যখন কমিয়ে শতকরা ১·৫—·১৫ মধ্যে রাখা হয়, তখনই তাকে বলা হয় ষ্টীল, এতে মরচে পড়ে না। ইস্পাত দিয়ে তৈরী অস্ত্রের ধার সহজে নষ্ট হয়

না। এই দিয়ে ছুরি, কাঁচি, ব্লেড ইত্যাদি তৈরী হয়। ভারতবর্ষে দুর্গাপুর, বার্ণপুর, জামসেদপুর, ভিলাই, রাউরকেলা, মহীশূরে, লৌহ নিষ্কাশনের কারখানা আছে।

জল

পৃথিবীর $\frac{2}{3}$ অংশই জল। জল যে শুধু পৃথিবীর উপর আছে তাই নয়, মাটির তলায়ও জলের আঁধার আছে। একেই আমরা বল্‌বো খনিজ জল। এই জল কি করে মাটির তলায় যায়?

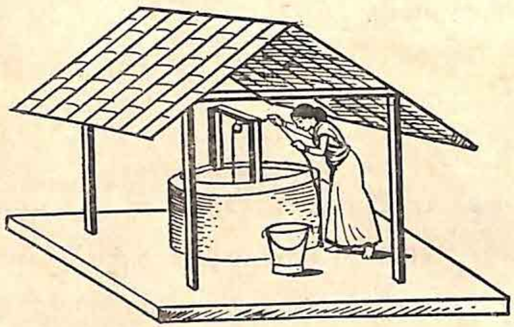
ভূত্বক অনেক রকম শিলাস্তর দিয়ে তৈরী। এর মধ্যে কতকগুলো শিলাস্তর আছে যার ভেতর দিয়ে জল যেতে পারে তাদের বলা হয় প্রবেশ্য শিলা, আর কতকগুলো শিলাস্তর আছে যার ভেতর দিয়ে জল চুইয়ে ভেতরে যেতে পারে না। এদের বলা হয়



২৪নং চিত্র—মাটির মধ্যে অপ্রবেশ্য স্তরের উপরে জলের অবস্থান

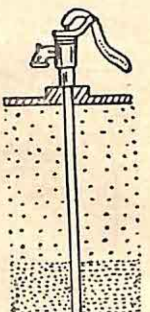
অপ্রবেশ্য শিলা। তোমরা জান, বৃষ্টি হ'লে কাদা হয়, কোথাও এক হাটু বা আরো বেশী। অর্থাৎ জল মাটির ভেতর দিয়ে চুইয়ে নীচের দিকে যায়। এখন এই বৃষ্টির জল বা নদী ইত্যাদির জল যে পর্যন্ত সচ্ছিদ্র স্তর আছে সে পর্যন্ত যেতে পারে। পথে যদি অপ্রবেশ্য শিলা পড়ে তাহলে আর যেতে পারে না। সুতরাং জল

গিয়ে জমা হয় প্রবেশ্য শিলাস্তরে। আবার এই প্রবেশ্য শিলাস্তরের



২৫নং চিত্র—ঢাকা কূপ

একই সমতলে যদি কোন ফাটল থাকে তখন জল তার সমতা ধর্ম রক্ষার জন্য ঝরণার বা প্রস্রবণের আকারে বেরিয়ে আসে। ভূগর্ভস্থ এই জল কুয়া খুড়ে বা নলকূপ বসিয়ে পাই। এই জল সাধারণতঃ ফুরায় না, কারণ সব সময়ই আশেপাশের জল চুইয়ে ঐ স্তরে এসে জমা হয়। কুয়ার জল সব সময় বিশুদ্ধ হয় না। যদিও এতে অদ্রব ময়লা থাকে না তবুও ওপর থেকে ময়লা পড়ে এই জলকে নোংরা করে। তাছাড়া অনেক রকম জীবাণু থাকে। একদিক থেকে নলকূপ অনেক নির্ভরযোগ্য। কারণ, এর তলায় ছাক্‌নি আছে, তাছাড়া ওপরেও ঢাকনা থাকে। সুতরাং নলকূপের জল বিনা দ্বিধায় পান করা যায়।



২৬নং চিত্র নলকূপ

প্রশ্নাবলী

(1) খনি ও খনিজ বল্তে কি বোঝ? ভারতবর্ষে কোথায় কিসের খনি আছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(2) কয়লার উৎপত্তি আর উত্তোলন সম্বন্ধে যা জান লিখ। কিভাবে কয়লা উত্তোলন করা হয়?

(3) পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি আর উত্তোলন সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(4) লোহা কি খনিজ থেকে প্রস্তুত করা হয়? কিভাবে লোহা নিষ্কাশন করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(5) জলকে খনিজ বলা হয় কেন? মাটির নীচের জলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যা জান লিখ। এই জল কি ভাবে আমরা ওপরে তুলি?

(6) শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(i) খনি থেকে যা পাওয়া যায় তাকে বলে·········।

(ii) কয়লার খনি প্রায়·········ফুট থেকে······ফুট পর্যন্ত গভীর হয়।

(iii) মাটির নীচের তেল তোলা হয়·········সাহায্যে।

(iv) আমাদের দেশে লোহা যে খনিজ থেকে প্রস্তুত হয় তার নাম······।

(v) মাটির নীচে জল থাকে·········স্তরের ওপরে।

(vi) লেহা নিষ্কাশনের জন্য যে চুল্লী ব্যবহার করা হয় তার নাম·········।

(vii) আমার দেশের প্রধান ছটি লোহার কারখানা হ'ল··············; ···········; ···········; ···········; ···········; ················; ········· জায়গায়।

(viii) যে লোহায় শতকরা ·১৫—·২৫ ভাগ কার্বন থাকে তাকে বলে ·········লোহা; যাতে শতকরা ১·৫—·১৫ ভাগ কার্বন থাকে তাকে বলে ···········লোহা আর যাতে শতকরা ২·২—৪·৫ ভাগ কার্বন থাকে তাকে বলে···········লোহা।

———

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥
মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ

শূন্যে ঢিল ছুড়লে তা কিছুক্ষণ বাদেই মাটিতে এসে পড়ে। ওপরে লাফ দিলেও কিছুক্ষণ পরেই সেই নীচে এসে পড়ি। আচ্ছা, পারা যায় না ঐ ঢিলটাকে চিরদিনের মত আকাশে উঠিয়ে দিতে; একটা 'শট' করে বলটা একেবারে আকাশে তুলে দিতে? চেষ্টা করে দেখা যাক না একবার বাতাসে ভাস্‌তে, শূন্যে চলাফেরা কর্‌তে। না, চেষ্টা কর্‌লেও আমরা তা পারি না। কিন্তু কেন, তা ভেবে দেখেছি কি?

একজন কিন্তু ভেবেছিলেন। তিনি হ'লেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন। তখনও তিনি বিখ্যাত হননি। একদিন গাছের তলায় বেঞ্চে বসেছিলেন। হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল পড়লো। চিরকালই ফল মাটিতে পড়ে। এ নিয়ে কেউ কোনদিন মাথা ঘামায়নি। কিন্তু তাঁর মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগলো, 'কেন আপেলটা মাটিতে পড়লো।' তাঁর মনের এই জিজ্ঞাসা থেকে আবিষ্কার হ'ল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির।

পৃথিবী সব কিছু বস্তুকেই তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ কর্‌ছে। তাই গাছের ফল উপরে না উঠে গিয়ে মাটিতে এসে পড়ে; কোন কিছু বস্তুকে শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে এসেই পড়ে। এই আকর্ষণের ফলেই চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ তার চারপাশে অবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই

দিন এই সামান্য আপেল পড়ার ঘটনা থেকেই নিউটন এই মহা সত্য আবিষ্কার করলেন।

নিউটন ব'ল্লেন—বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ পরস্পরকে সর্বদাই আকর্ষণ কর্‌ছে। এরই নাম হ'ল **মহাকর্ষ**। এই আকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে দুটো জিনিসের উপর। বস্তুদ্বয়ের ভর, আর বস্তুদ্বয়ের দূরত্বের উপর। ভর বেশী হ'লে মহাকর্ষ বেশী হয়, দূরত্ব বেশী হ'লে মহাকর্ষ কম হয়।

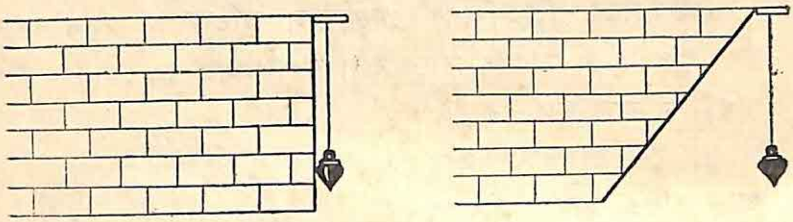
এই মহাকর্ষ শক্তির বিশেষ ক্ষেত্র হ'ল অভিকর্ষ। কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর যে আকর্ষণ, তাকে বলা হয় **অভিকর্ষ**। কোন বস্তুকে পৃথিবী যে বলে তার কেন্দ্রের দিকে টানে তাই হ'ল তার ওজন যদিও আমরা সাধারণ অর্থে ওজন ব'লতে তুলাদণ্ডের ওজন বুঝি। কিন্তু তুলাদণ্ডের ওজন করে আমরা যা পাই তাহ'ল ভর, অর্থাৎ, বস্তুতে জড়ের পরিমাণ। সুতরাং এত' ঠিক যে পৃথিবীস্থিত কোন বস্তুর ওজন নির্ভর করছে অভিকর্ষের উপর।


২৭নং চিত্র—নিউটন

আগেই বলেছি মহাকর্ষ নির্ভর করে বস্তুর ভরের ওপর। পৃথিবীর চেয়ে সূর্য বড় সুতরাং তার ভরও বেশী। আবার চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে ছোট সুতরাং তার ভরও কম। এখন একই বস্তু যদি

পৃথিবীর উপর থাকে তাকে পৃথিবী যে বলে টান্‌ছে, সেই বস্তু সূর্যের উপরে থাক্‌লে তাকে সূর্য তার চেয়ে বেশী বলে টান্‌বে। সেইরূপ চাঁদ কম বলে টান্‌বে। সুতরাং তাদের ওজনের পার্থক্য হবে। কোন বস্তুর ওজন যদি পৃথিবীতে ১ কিলো হয়, তাহ'লে সূর্যে তার ওজন হবে ২৭ কিলো আর চাঁদে ওজন হবে ⅙ কিলো। মহাকর্ষ শক্তির জন্যই পৃথিবীর জল ফুলে উঠে জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টি হচ্ছে।

ওলন দড়ি—রাজমিস্ত্রিরা ওলন দড়ি ব্যবহার করে। জিনিসটা



২৮নং চিত্র—ওলন দড়ির কাজ

দেখ্‌তে খুব সামান্য হলেও এখানে অভিকর্ষ শক্তির জ্ঞানেরই প্রয়োগ করা হয়। জিনিসটা কিছুই নয়, একটা কাঠের টুক্‌রোর মাঝামাঝি ফুটো করে তার ভেতর একটা সূতো গলিয়ে দেওয়া হয়। ঐ সূতোর এক প্রান্তে একটা লোহার, সীসার অথবা পেতলের বল বাঁধা থাকে। কাঠের টুক্‌রোর দৈর্ঘ্য এবং পিণ্ডের ব্যাস এক থাকে। এখন ওটাকে যদি কাঠের টুকরোটা ধরে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহ'লে অভিকর্ষের ফলে পিণ্ডটা নীচের দিকে সূতোয় ঝুল্‌তে থাক্‌বে। সূতোটা তখন ভূমির সাথে লম্বভাবে থাকবে।



ওলন দড়ি

এই অবস্থায় যদি কাঠের প্রান্ত দেওয়ালের ওপরে ঠেকানো যায়

তাহ'লে পিণ্ডটাও এসে দেওয়ালে স্পর্শ করা উচিত। যেহেতু পিণ্ডের ব্যাস ও কাঠের দৈর্ঘ্য সমান। যদি দেওয়াল সোজা থাকে তাহ'লে নিশ্চই স্পর্শ করবে কিন্তু যদি বাঁকা থাকে তাহ'লে গণ্ডগোল হবে। দেওয়াল সোজা না হ'লে মজবুত হয় না। তাই রাজমিস্ত্রীরা ওলন ঝুলিয়ে দেওয়ালে গাঁথনি করে।

প্রশ্নাবলী

(1) মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ কাকে বলে ? ভালভাবে বুঝিয়ে দাও।

(2) অভিকর্ষ কাকে বলে ? ওলন দড়ির কার্য প্রণালীর বর্ণনা দাও।

(3) কোন বস্তুর ওজন চাঁদে কম ও পৃথিবীতে কেন বেশী হয় বুঝিয়ে বল।

(4) শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(a) মহাকর্ষ শক্তির আবিষ্কর্তা হ'লেন ....।

(b) পৃথিবী যে শক্তিতে তার ওপরের সমস্ত বস্তুকে টানছে তাকে বলে......।

(c) অভিকর্ষের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীস্থিত কোন বস্তুর.........।

(d) কোন বস্তুর পৃথিবীতে ওজন চাঁদের ওপরের ওজনের চেয়ে.....গুণ বেশী ও সূর্যের ওপরের চেয়ে.........গুণ কম।

—·—

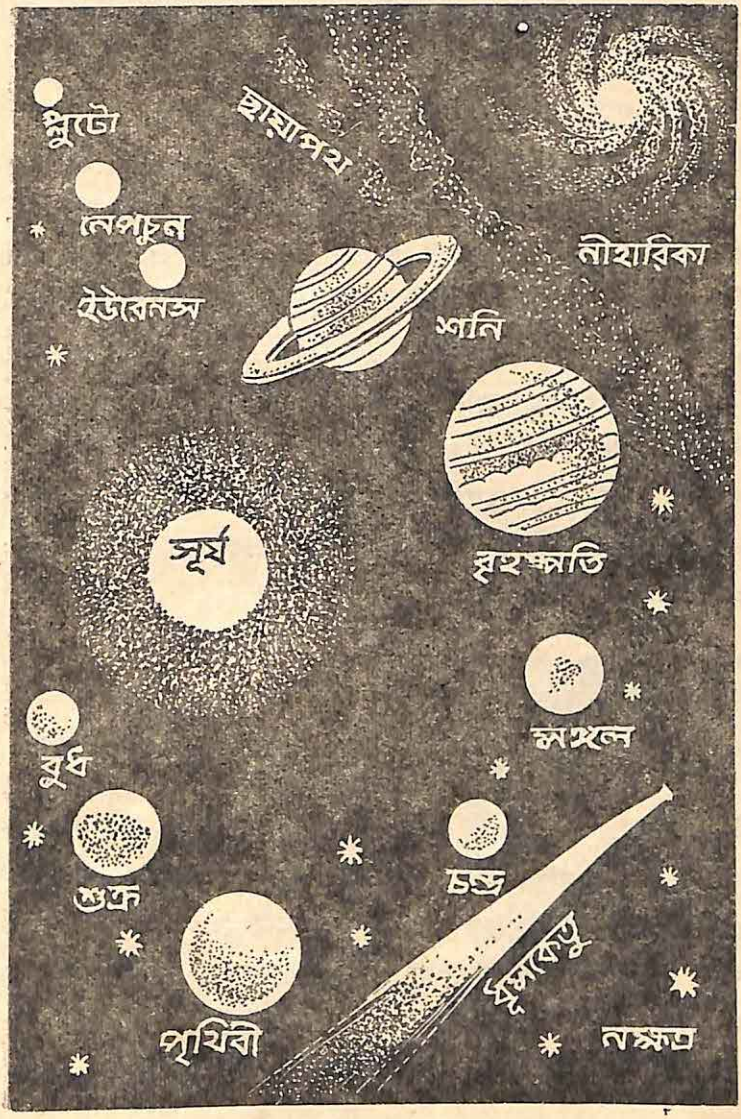
॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

সৌরজগৎ

পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অভাব নেই। নেই বা রইল দিনের আলো। রাতের আকাশের দিকে একবার তাকালেই বোঝা যায় সৌন্দর্য্য তারও কিছু কম নেই। অসংখ্য হীরা মুক্তা মাণিক্যের টুক্‌রো দিয়ে পৃথিবীর ওপরে বিরাট এক চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে সে।

কবি কল্পনায় হয়তো ঐ গুলোকে হীরা মুক্তা ইত্যাদি অনেক কিছুই বলা যায়। কিন্তু আসলে তো আর তা নয়। ঐ যে জ্বল্‌জ্বলে জিনিসগুলো আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, তা হ'ল ঐ বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলো। এদের প্রত্যেককেই বলা হয় জ্যোতিষ্ক।

দিনের বেলায় একটি জ্যোতিষ্ক আমরা দেখতে পাই সে হ'ল সূর্য। সূর্য হ'ল জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড। অনেক অনেক দিন আগে সূর্যের থেকেও অনেক বড় এক জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে সূর্য থেকে আরও ন'টি নতুন জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়। এদের বলা হয় গ্রহ। গ্রহগুলো যে যার নিজের নির্দিষ্ট পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ন'টি গ্রহের নাম হ'ল বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো। এর মধ্যে বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ আর প্লুটো দূরতম গ্রহ। বুধের পর শুক্র; শুক্রের পরে পৃথিবী, এইভাবে গ্রহগুলো রয়েছে। গ্রহ থেকে যে জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় উপগ্রহ। উপগ্রহ আবার,



২৯নং চিত্র—সৌরজগৎ

যে গ্রহ থেকে সৃষ্টি হ'য়েছে তার চারদিকে নিজের কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্র পৃথিবীর একটা উপগ্রহ। এই গ্রহ ও উপগ্রহকে আমরা আকাশে আলোকিত অবস্থায় দেখি। এদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলো এদের ওপর পড়ে এদের আলোকিত করে। পৃথিবী আর বৃহস্পতির মাঝখানে অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রহ রয়েছে। সূর্য, গ্রহ আর উপগ্রহ সবগুলো মিলে যে জগতের সৃষ্টি করেছে এককথায় আমরা তাকে সৌরজগৎ বলি। এই সৌরজগতের প্রাণ হ'চ্ছে সূর্য।

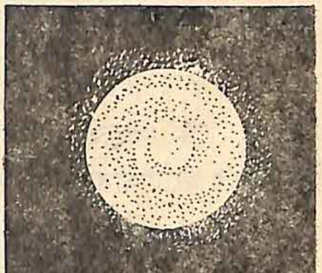
গ্রহ ও তারকা :—আকাশে সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ ছাড়া আরও অসংখ্য জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। এগুলোকে বলা হয় নক্ষত্র বা তারকা। এখন কি করে বোঝা যাবে কোন্‌টা গ্রহ আর কোন্‌টা তারকা? গ্রহ আর তারকার মধ্যে কতকগুলো পার্থক্য আছে। পার্থক্যগুলো নীচে দেওয়া হ'ল :—

গ্রহ	তারকা
১। প্রত্যেক গ্রহ সূর্যের থেকে সৃষ্টি হয়েছে।	১। তারকাগুলো প্রত্যেকটাই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড। এরা সূর্যের থেকে সৃষ্টি হয়নি।
২। গ্রহের কোন নিজস্ব আলো নেই। সূর্যের আলো এদের ওপর পড়ে এদের আলোকিত করে।	২। তারকার নিজস্ব আলো আছে। সূর্যও একটি তারকা।
৩। গ্রহের আলো স্থির।	৩। তারাগুলো মিট্‌মিট্‌ করে আলো দেয়।

সূর্য

"সূর্যি মামা দেয় হামা, গায়ে রাঙা জামা ঐ—"

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে পূব আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যায় পূব আকাশটা আস্তে আস্তে লাল হ'য়ে উঠ্ছে। আরো পরে পরিষ্কার চোখে পড়ে একটা গোল বড় লাল থালার মত সূর্য দিগন্ত থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আস্ছে। 'মামা' গায়ে লাল জামা পরে হামাগুড়ি দিয়ে উঠ্লেন। আমরা বলি সূর্য উঠ্লো। তারপর কিছু সময়ের মধ্যে আর তার দিকে তাকানো যায় না। তখন তার চোখ ঝল্সানো আলো। তাপও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। আবার দিনের শেষে সারা আকাশের উপর রথে চড়ে ঘুরে বেড়িয়ে পশ্চিম দিকে চলে যান। তখনও পড়ন্ত বেলায় আবার সূর্যকে একটা লাল থালার মত দেখা যায়। কোনদিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।



৩০নং চিত্র—সূর্য

আকাশের সবচেয়ে উত্তপ্ত জ্যোতিষ্ক হ'ল সূর্য। সূর্যকে আমরা বড় থালার মত দেখ্লেও আসলে এটা পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড়। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তের লক্ষ গুণ বেশী। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বও প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। তাই একে এত ছোট দেখায়। এতদূরে থেকেও সূর্য আমাদের যা উত্তাপ দেয় তাতে জ্বলে-পুড়ে মরার যোগাড়। আবার সূর্য না থাক্লেও

আমরা বাঁচতে পারি না। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে, উত্তাপ থাক্‌বে না, সব ঠাণ্ডা। এই মত অবস্থায় কোন প্রাণীরই থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং বুঝ্‌তে পারা যায় সূর্য যদি আরো কাছে থাক্‌তো তাহ'লে আমরা জ্বলে-পড়ে ছারখার হ'য়ে যেতাম, আবার যদি না-থাকতো তাহ'লেও আমরা বাঁচতাম না। এটা হ'ল জীবনের অংগ। পুরাণে তাই সূর্য-পূজার রীতি আছে।

সূর্যটা জ্বলন্ত একটা চুল্লির মত। আলো আর উত্তাপের উৎস। এই জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক থেকে প্রচণ্ড তাপের খুব সামান্য অংশই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। প্রায় ২৩ কোটি ভাগের একভাগ। পূর্ণিমা রাতে চাঁদের থেকে যে আলো পাওয়া যায় সূর্যের আলো তার থেকে ৬ লক্ষ গুণ বেশী উজ্জ্বল। সূর্যের পরিধি প্রায় ২৭ লক্ষ ১৬½ হাজার মাইল। সে অনুপাতে পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল।

রঙিন কাঁচঢাকা দুরবীণের সাহায্যে দেখ্‌লে সূর্যের গায়ে অনেক কালো কালো গহ্বর দেখা যায়। এই গহ্বরগুলো কোন কোনটা এত বড় যে, তার মধ্যে পৃথিবী ঢুকে যেতে পারে। এগুলোকে বলা হয় 'সৌর কলঙ্ক'। সূর্যের উপরে সারাক্ষণ তোলপাড় চল্‌ছে। হাজার মাইল ওপের উঠে আস্‌ছে আগুনের শিখা।

আলোর উৎস—সূর্য

দিবা-রাত্রির কারণ ঃ

আমরা বলি সূর্য উঠে আর অস্ত যায়। অর্থাৎ পূর্ব দিগন্ত থেকে উঠে সারা আকাশ ঘুরে পশ্চিম দিগন্তে লুকিয়ে যায়। তখন নেমে আসে রাত্রি। সূর্যের আলোয় আলোকিত অংশকে বলি দিন, আর সেই

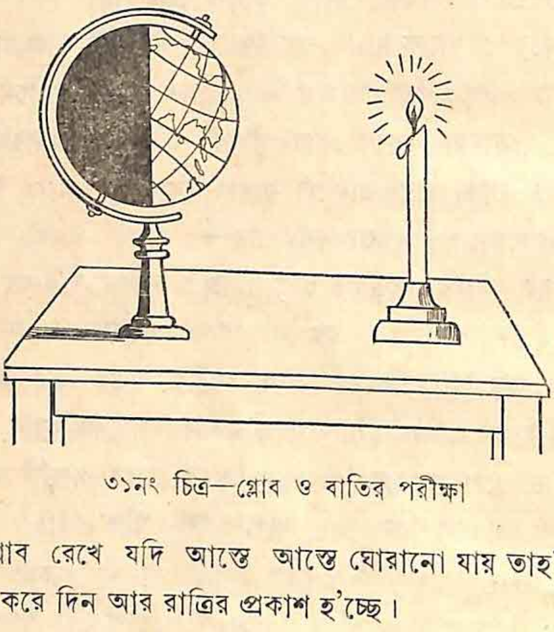
সূর্যের আলো যখন থাকে না তখন তাকে বলি রাত্রি। এই দিবা-রাত্রির খেলা যুগ যুগ ধরে চলছে। কিন্তু কি করে এমন হয়? আমরা বলি—সূর্য উঠ্ছে আর ডুব্ছে। অর্থাৎ, সূর্যই ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাই কি ঠিক? না; তবে?

আপাতদৃষ্টিতে আমরা সূর্যকে ঘুরতে দেখলেও, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। সূর্য স্থির। পৃথিবীই তার চারপাশে ঘোরার সময় একটা লাট্টুর মত নিজে পাক খাচ্ছে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। তোমরা বলতে পার পৃথিবী যদি লাট্টুর মত নিজের অক্ষের উপর পাক খায় তাহ'লে আমরা সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখবো কেন? আচ্ছা দেখা যাক্—

ধরে নেই আমরা গাড়ীতে চড়ে যাচ্ছি। তখন বাইরের লোক অথবা গাছপালাকে মনে হয় না কি সেগুলো উল্টো দিকে দৌড়ে পালাচ্ছে, আর আমরা স্থির আছি, গাড়ী স্থির আছে? আবার বাইরের কোন লোক গাড়ী বা আমাদের ছুটে যেতে দেখ্বে। তা'হলে কার ভুল? কিন্তু আমরা জানি গাড়ীই চল্ছে। এ রকম হয়। একে বলা হয় **আপেক্ষিক গতি**। ঠিক একই রকম ব্যাপার সূর্য এবং পৃথিবীর বেলা হয়। পৃথিবী একটা লাট্টুর মত পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরছে, তাই পৃথিবী থেকে সূর্যের আপেক্ষিক গতিই আমরা দেখ্ছি। আর এই জন্যই মনে হ'চ্ছে সূর্য পূর্ব থেকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর এইভাবে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা। একে বলে **আহ্নিক গতি**।

কিন্তু একটা গোল পদার্থের একদিকে আলো রাখলে তার সম্পূর্ণটায় কোন সময় আলো পড়তে পারে না; অর্ধেকটা অংশ

আলোকিত হ'তে পারে। পৃথিবীর বেলাও তাই। প্রত্যেক অবস্থানের জন্য সূর্যের দ্বারা পৃথিবীর অর্ধেকটা অংশ মাত্র আলোকিত হতে পারে। তখন সেই অংশটা হয় দিন, আর বাকি যে অর্ধেক অংশ আলোকিত হয় না তা হ'ল রাত্রি। টেবিলের উপর একটা বাতি



৩১নং চিত্র—গ্লোব ও বাতির পরীক্ষা

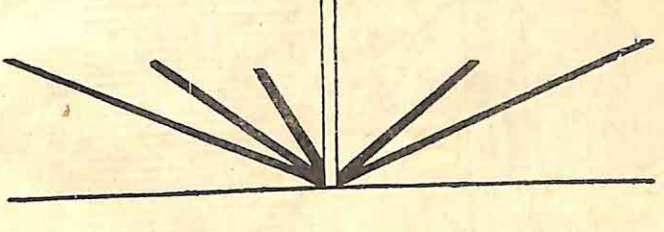
আর গ্লোব রেখে যদি আস্তে আস্তে ঘোরানো যায় তাহ'লে দেখা যায় কি করে দিন আর রাত্রির প্রকাশ হ'চ্ছে।

দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি :

উঠানে যদি একটা কাঠি ঠিক লম্বভাবে পুতে ছায়ার অবস্থান পর্যবেক্ষণ কর, তাহলে সকালের দিকে সূর্য যখন পূর্বে উঠবে তখন তার ছায়া হবে পশ্চিম দিকে, আর বেশ লম্বাও। ক্রমে বেলা বাড়ার সংগে সংগে ছায়া ছোট হ'তে থাকবে। দুপুরে এই ছায়া সবচেয়ে ছোট হবে। তারপর সূর্য যত পশ্চিম দিকে যেতে থাকবে

ছায়া পূর্ব দিকে হবে এবং ক্রমশ বড় হতে থাকবে। সূর্যাস্তের সময় ছায়া আবার সবচেয়ে বড় হবে। এই হ'ল যে কোন ছায়ার ধর্ম।

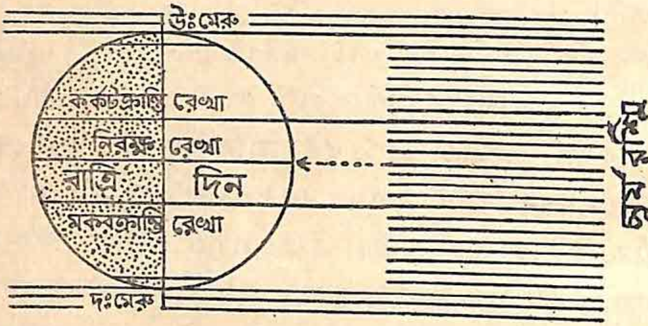
এখন যদি প্রতি মাসের একটা বিশেষ দিনের দুপুরের ছায়ার মাপ লিখে রাখ তাহ'লে দেখবে প্রতি মাসে এই ছায়ার মাপ তো সমান হবে না—তা' ছাড়া কখনও এই ছায়াকে দেখা যাবে কাঠি থেকে উত্তর দিকে কখনও দক্ষিণ দিকে। এর একমাত্র কারণ হ'ল আলোর উৎস ঠিক এক জায়গায় নেই। তাই ছায়াও সেইমত বেঁকেছে। এই আলোর উৎস সূর্য, তাহ'লে কখনও দক্ষিণে সরে গেছে কখনও উত্তরে সরে গেছে। আমরা যদি এমনি লক্ষ্য করি তাহ'লেও দেখবো যে প্রতি মাসে সূর্য একই জায়গায় উঠে না বা একই জায়গায় ডুবে না। ডিসেম্বর মাসে সূর্য অনেকটা দক্ষিণ দিকে সরে যায়। এর নাম **সূর্যের দক্ষিণায়ন**। এইসব মাসে বাড়ির জানালায় রোদ প'ড়লে দেখবে এ সময় গরাদের জানালার ছায়া



৩২নং চিত্র—কাঠির ছায়া

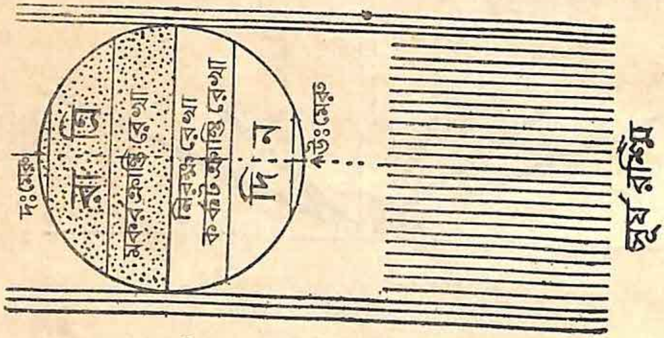
উত্তর দিকে হেলে আছে। এই সময় দিন ছোট আর রাত্রি বড় হয়। ২১শে ডিসেম্বর সূর্য সবচেয়ে দক্ষিণ দিকে সরে উঠে। আবার জুন মাসে দেখা যায় সূর্য অনেকটা উত্তর দিকে সরে এসেছে।

অস্ত এবং উদয় পূর্বাকাশের উত্তর দিক থেকে হচ্ছে। একে বলে সূর্যের উত্তারায়ন। এ সময়ে রাত ছোট হয়, দিন বড় হয়। ২১শে



৩৩নং চিত্র—পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানে সূর্যরশ্মি

জুন সূর্য সবচেয়ে বেশী উত্তরে সরে যায়। আবার দেখা যায় ২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর ঠিক সোজা পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হয়। এই দুই তারিখে দিন ও রাত্রি সমান।



৩৪নং চিত্র—পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থানে সূর্যরশ্মি

এখন পৃথিবী যদি একই জায়গায় দাড়িয়ে থাকতো আর পাক খেতো তাহ'লে সুর্যোদয় সূর্যাস্ত দৈনিক একই জায়গায় হ'তো। কিন্তু

পৃথিবী নিজের কক্ষপথে সূর্যের চারদিকেও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার এই কক্ষপথ মেরু রেখার সংগে হেলান হ'য়ে আছে। তাই বিভিন্ন দিন বিভিন্ন জায়গায় সূর্য উঠ্‌তে দেখা যাচ্ছে। আপন কক্ষপথে পৃথিবীর অবস্থান অনুযায়ী কখনও দক্ষিণ গোলার্ধ আবার কখনও উত্তর গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসে। এর ফলেই দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। পৃথিবীর আপন কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আস্‌তে সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা বা এক বছর। একে বলে পৃথিবীর **বার্ষিক গতি**।

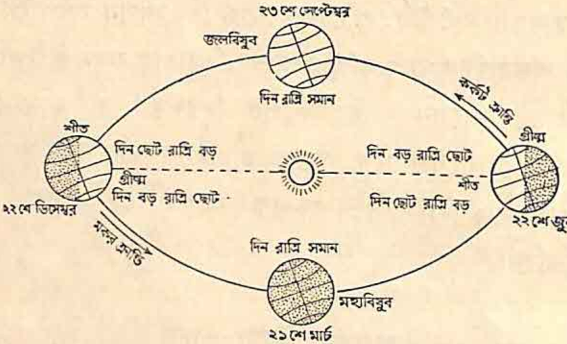
তাপের উৎস—সূর্য

তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন :

সূর্যরশ্মি যদি কোন স্থানের উপর লম্বভাবে পড়ে তাহ'লে সেই স্থানের উত্তাপ বেশী হয়। এর কারণ সূর্যরশ্মি যখন লম্বভাবে আসে তখন তাকে সবচেয়ে কম বায়ুস্তর ভেদ করে আস্‌তে হয়। ফলে বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত কম তাপ শোষণ করে। কিন্তু যখন হেলান হ'য়ে আসে তখন তাকে অনেক বেশী বায়ুস্তর ভেদ করতে হয়, আর ঐ বায়ুস্তর বেশী করে শোষণ করে নেয়। এছাড়া লম্বভাবে আগত রশ্মি পৃথিবীর কম অংশের উপর পড়ে কিন্তু তির্যকভাবে আগত রশ্মি বেশী জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলেও তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

এখন ২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ফলে এই সময় উত্তর গোলার্ধে দিন বড় হ'তে থাকে, রাত্রি ছোট হ'তে থাকে। এই দিন বড় হওয়ার ফলে সূর্য বেশী সময় ধরে আলো ও তাপ বিকিরণ করে। এই তাপ ভূপৃষ্ঠ

শোষণ করে। এখন সারাদিন ধরে ভূপৃষ্ঠ যতটা তাপ শোষণ করে রাত্রি ছোট হওয়ার জন্য রাত্রিতে তার সবটা বিকিরণ করতে পারে না।



৩৫নং চিত্র—সূর্যের উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি

কিছুটা তাপ থেকে যায়। এছাড়াও সূর্য তখন এই অংশের উপর লম্বভাবে থাকার জন্য বেশী তাপ দিতে থাকে। এই কারণে এই সময়ের ভেতর উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। এই সময় উত্তর গোলার্ধে হয় গ্রীষ্মকাল।

২১শে জুনের পর থেকে উত্তর গোলার্ধ দিন দিন আবার সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এটা চল্‌তে থাকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। দিনও কমতে থাকে। ২২শে সেপ্টেম্বর দিনরাত্রি সমান হ'য়ে যায়। এই সময় তাপমাত্রা বেশী থাক্‌লেও দিনরাত্রির ব্যবধান কমে আসে বলে উত্তাপ অত বোঝা যায় না। একে বলে শরৎ কাল।

২২শে সেপ্টেম্বর থেকে দিনের চেয়ে রাত্রি বড় হয়। পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু সূর্যের কাছে আসে, উত্তর মেরু দূরে সরে যায়। সূর্যের দক্ষিণায়নের জন্য সূর্যরশ্মিও তখন উত্তর গোলার্ধে তির্যকভাবে পড়ে।

ফলে তাপমাত্রাও কম্‌তে থাকে। ২১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই রকম চল্‌তে থাকে। তখন হয় উত্তর গোলার্ধে শীতকাল যদিও দক্ষিণ গোলার্ধে তখন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম।

২১শে ডিসেম্বরের পর থেকে দিন আবার বড় হ'তে থাকে এবং ২১শে মার্চ আবার দিনরাত্রি সমান হয়। এই সময় দিনরাত্রির ব্যবধার কম থাকার জন্য ও সূর্য ক্রমশ উত্তর গোলার্ধের দিকে এগিয়ে আসার ফলে শীত কম্‌তে থাকে, উত্তাপও বাড়তে থাকে। একে বলে বসন্ত কাল।

ঠিক উল্টোভাবেই দক্ষিণ গোলার্ধে ঋতু পরিবর্তন হ'তে থাকে। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল, আবার উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্তকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মের শেষ অর্থাৎ শরৎ কাল।

খুব সূক্ষ্ম বিচার করে দেখ্‌লে দেখা যাবে ঋতু মাত্র দুটিকে বলা যায়—শীত ও গ্রীষ্ম। শীত থেকে গ্রীষ্মে পরিবর্তন হওয়ার পথে আসে বসন্ত আর গ্রীষ্ম থেকে শীতে পরিবর্তনের পথে আসে শরৎ। আমরা শিখেছি, 'ছয় ঋতু'। হ্যাঁ, আমাদের দেশে ছয়টা ঋতুর প্রচলন আছে। এ চারটা তো আছেই, তা' ছাড়া দুটো হ'ল বর্ষা আর হেমন্ত। গ্রীষ্ম আর শরতের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তাই এদেশের লোক এই সময়ের নাম দিয়েছে বর্ষাকাল। আষাঢ়-শ্রাবণ ইংরেজী প্রায় জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত। আবার শরৎ ও শীতের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে, একটা বেশ শীতের আমেজ আসে। বাতাস প্রায় শুষ্ক হ'য়ে আসে, একে বলে হেমন্ত কাল। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস অর্থাৎ ইংরেজি প্রায় অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। সাধারণত এই ছয় ঋতুর প্রতিটি

ছ'মাস ধরে চলে। বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য গ্রীষ্ম, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র-আশ্বিন শরৎ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ-মাঘ শীত, আর ফাল্গুন-চৈত্র মাসকে বসন্ত কাল হিসাবে ধরা হয়।

বিভিন্ন ঋতুর বৈশিষ্ট্যগুলো সম্বন্ধে তোমরা নিজেরা লক্ষ্য করে তোমাদের বিজ্ঞান খাতায় লিখে রাখ।

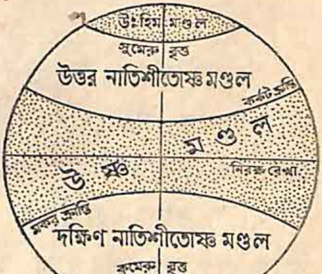
তাপমণ্ডল ঃ

আমরা যদি সারাদিনের বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রা পরীক্ষা করি তাহ'লে দেখ্‌বো সকালে ও বিকালে তাপমাত্রা কম এবং দুপুরে তাপমাত্রা বেশী। এ আমরা সাধারণভাবেও বুঝ্‌তে পারি। দুপুরে গরম সবচেয়ে বেশী হয় আর সন্ধ্যায় সকালে কম হয়। এর কারণ, সকালে আর সন্ধ্যায় সূর্যরশ্মি হেলে এসে পৃথিবীতে পড়ে আর দুপুরে সোজাসুজিভাবে পড়ে। ঠিক এই রকমই পৃথিবীর মাঝামাঝি জায়গায় অর্থাৎ নিরক্ষ রেখার উপর সূর্যকিরণ লম্বভাবে পড়ে কিন্তু দুই মেরু অঞ্চলে তা হেলে পড়ে। সুতরাং নিরক্ষরেখার উপর উষ্ণতা সবচেয়ে বেশী এবং মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে কম হওয়া স্বাভাবিক। আর এদের মাঝামাঝি অঞ্চলে উষ্ণতা খুব বেশী বা খুব কম হয় না। উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠকে কতকগুলো অংশে ভাগ করা হয়েছে, তাকে বলে **তাপমণ্ডল**।

নিরক্ষরেখা থেকে সূর্য একবার দক্ষিণে যায় আর একবার উত্তরে যায়। একে বলে আয়ন। কিন্তু এই যাওয়ারও একটা সীমা আছে। উত্তরদিকেই হউক আর দক্ষিণ দিকেই হউক সূর্যের অবনতি নিরক্ষ রেখা থেকে কোন সময় ২৩½° ডিগ্রীর বেশী হয় না। অর্থাৎ সব

সমেত ৪৭° ডিগ্রীর ভেতরই এই অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকে। ওপরে ২৩½° ডিগ্রীর অবনতিতে বা উত্তরায়নের শেষ সীমায় যে রেখাকে কল্পনা করা হয় তাকে বলে **কর্কট ক্রান্তি** আর দক্ষিণায়নের সীমা-রেখাকে বলা হয় **মকরক্রান্তি**। কাজেই এই ক্রান্তি-রেখার মাঝে যে পৃথিবীর অংশ আছে তার কোন-না-কোন অংশে সূর্য বছরে একবার বা আরো বেশী বার লম্বভাবে কিরণপাত করে। এর ফলে এই অংশের তাপমাত্রা সব সময়ে বেশী থাকে। তাই একে বলা হয় **উষ্ণ মণ্ডল**।

দুদিকের ক্রান্তি রেখাগুলোর পরের অংশে সূর্যকে কোন সময়ে মাথার উপর দেখা যায় না। সব সময়ে সূর্য হেলান দিয়ে কিরণ দেয়। সুতরাং এখানে উষ্ণতাও কম, শৈত্যও কম। এখানে দিনের পরিমাণও কম হয়। এই অংশ দু'দিকে ক্রান্তি-রেখা থেকে মেরুবৃত্ত (৬৬½°) পর্যন্ত বিস্তৃত। এর নাম হ'ল **নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল**। উত্তর দিকের অংশকে বলা হয় উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল আর দক্ষিণ দিকের অংশকে বলা হয় দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল।



৩৬নং চিত্র—তাপমণ্ডল

এর পরের অংশ মেরুপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে সূর্যকে দিগন্ত রেখার ২৩½° ডিগ্রী ওপরে উঠ্‌তে দেখা যায় না। সুতরাং এই অঞ্চলে সূর্য সবচেয়ে বেশী হেলে কিরণ দেয়। আর এই মেরু অঞ্চলে ছয় মাস সূর্য দেখাই যায় না। এই সব কারণে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা অত্যন্ত কম। তাই এখানে বছরের সারা সময় বরফ থাকে। একে বলা হয় **হিমমণ্ডল**। উত্তর অংশের নাম

উত্তর হিমমণ্ডল আর দক্ষিণ অংশের নাম দক্ষিণ হিমমণ্ডল। তাহ'লে আমরা ভূপৃষ্ঠকে উত্তাপের তারতম্য অনুযায়ী পাঁচটি তাপমণ্ডলে ভাগ করতে পারি—কর্কট ও মকর ক্রান্তির মধ্যের অংশ উষ্ণ মণ্ডল, ক্রান্তি-রেখা ও মেরুবৃত্তের মধ্যের অংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (উত্তর ও দক্ষিণ); মেরুবৃত্তের পরের অংশ হিমমণ্ডল (উত্তর ও দক্ষিণ)।

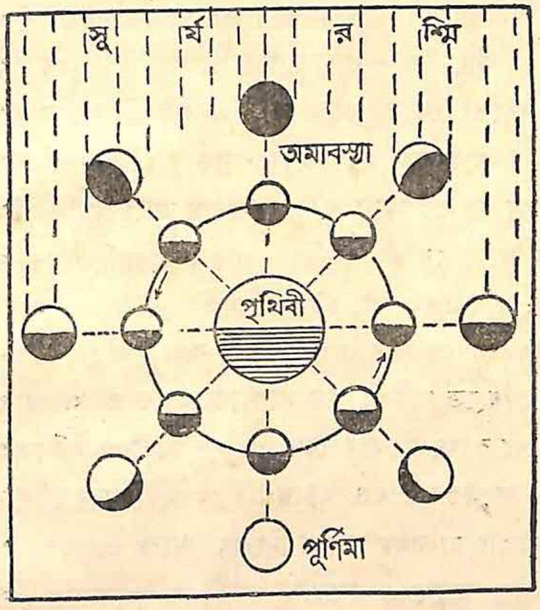
চাঁদ

'চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা'—মা ডাকেন চাঁদকে। পূর্ণিমা রাতে চাঁদকে আকাশের কপালে একটা টিপের মত মনে হয়। মাও চান সেই টিপ তাঁর ছেলেকে পরিয়ে দিতে। কিন্তু চাঁদ কি আর আসে, না তাকে ধরা যায়! অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের চেয়ে চাঁদ অনেক কাছে থাকলেও তার দূরত্ব দু'লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল। তাই আকাশের কপালে ছোট্ট টিপের মত মনে হ'লেও আসলে চাঁদ অত ছোট নয়।

চাঁদের সম্বন্ধে এরকম অনেক সাধারণ ধারণা আছে। জ্যোৎস্নাকে আমরা বলি চাঁদের আলো। কিন্তু আসলে চাঁদের কোন আলো নেই। আলো হ'লো সূর্যের। পৃথিবীতে যখন সূর্যের আলো আসছে না, তখন তা চাঁদের বুকে প্রতিফলিত হ'য়ে যেটুকু পৃথিবীতে আস্‌ছে তাই হ'ল জ্যোৎস্না। আর এই প্রতিফলনের জন্য আমরা চাঁদকে দেখতে পাই।

কিন্তু এই চাঁদকে আমরা বিভিন্ন দিন বিভিন্ন আকারে দেখি। পূর্ণিমার দিন দেখি সম্পূর্ণ গোল, তারপর যত দিন যেতে থাকে তত

তার খানিকটা অংশ কাটা পড়ে যায়। এমনি করে অমাবস্যার দিন আর তাকে দেখাই যায় না। আবার তারপর থেকে চাঁদ একটু একটু



৩৭নং চিত্র—চাঁদের কলা

করে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এক একটি অবস্থাকে বলা হয় চাঁদের কলা। এর কারণ হ'ল—চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। সূর্যের আলোয় চাঁদের যে অংশ আলোকিত হ'চ্ছে তার সবটা পৃথিবীর দিকে ঘুরানো থাকে না। তার এই বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী

আলোকিত অংশ কম আর বেশী দেখা যায়। প্রতি পূর্ণিমায় চাঁদের সম্পূর্ণ আলোকিত অংশটা পৃথিবীর দিকে থাকে আর অমাবস্যায় ঐ আলোকিত অংশটা উল্টো দিকে থাকে।

দূরবীণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে চাঁদের গায়ে অনেক কালো কালো দাগ আছে। চাঁদকে আপাতভাবে যত সমতল দেখায় আসলে তা নয়। উঁচু, নীচু,—পাহাড় আর গর্তে ভর্তি। এই সব গর্তগুলোয় সূর্যের আলো যেতে পারে না। তাই ঐ সব অংশগুলো কালো দেখায়। একে বলা হয় 'চাঁদের কলঙ্ক'। চাঁদের ওপরের এই অবস্থা দেখে মনে হয় এককালে ওখানে অনেক আগ্নেয়গিরি ছিল। অগ্নুৎ-পাতের ফলে যে সব গলিত ধাতব পদার্থ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়েছে, তাই এখন জমা হ'য়ে আছে।

চাঁদের সম্বন্ধে আর একটা মজার কথা হ'ল যে, এর একটা দিকই আমরা দেখ্‌তে পাই। অন্যদিকে কি আছে তা আমরা জানতে পারি না। এর কারণ হ'লো—চাঁদ যেমন পৃথিবীর চারদিকে ঘুর্‌ছে তেমনি নিজের অক্ষের উপরও ঘুর্‌ছে। পৃথিবীর চারপাশে কক্ষপথে ঘুরে আস্‌তে তার যা সময় লাগে নিজের অক্ষে একবার সম্পূর্ণ ঘুরতেও সেই সময় লাগে। সুতরাৎ যখন সে আমাদের চোখের সামনে আসছে তখনই তার যেদিকটা আগে আমাদের দিকে ঘোরানো ছিল, সেটাই আবার দেখ্‌ছি।

আজকাল মানুষ চাঁদে যেতে চেষ্টা কর্‌ছে। যদি পেঁৗছে যায়, সেদিনই সে ভাল করে বুঝ্‌তে পার্‌বে তার অবস্থা কি রকম। তবে বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন সেখানে জল, বাতাস কিছুই নেই। সুতরাং প্রাণেরও কোন চিহ্ন নেই।

প্রশ্নাবলী

(1) সৌরজগৎ বলতে কি বোঝ ? তারা আর গ্রহের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দাও।

(2) সূর্য সম্বন্ধে যা জানো লেখো।

(3) দিনরাত্রি কিভাবে হ'চ্ছে তা বুঝিয়ে দাও।

(4) তাপমণ্ডল কাকে বলে বুঝিয়ে বল।

(5) ঋতু পরিবর্তনের কারণ কি ? ছবি এঁকে বুঝিয়ে দাও।

(6) চাঁদ সম্বন্ধে যা জান লিখ। চাঁদের কলা কাকে বলে ?

(7) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—

(i) সূর্য সৌরজগতের··· ।

(ii) সূর্য থেকে যে সৌরবস্তুর উৎপত্তি হ'য়েছে তাকে বলে······ ।

(iii) গ্রহ থেকে যাদের উৎপত্তি হ'য়েছে তাদের বলা হয়······ ।

(iv) গ্রহগুলো······চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

(v) চাঁদ একটা······ ।

(vi) সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহের নাম······আর সবচেয়ে দূরের গ্রহের নাম······ ।

(vii) বিভিন্ন তিথিতে চাঁদের বিভিন্ন অবস্থাকে বলে চাঁদের······ ।

(8) সঠিক উত্তরটির নীচে দাগ দাও ঃ—

প্রশ্ন	উত্তর
(a) চাঁদ যে গ্রহের উপগ্রহ তার নাম কি ?	(a) বুধ, পৃথিবী, শুক্র।
(b) উষ্ণতার তারতম্য অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠকে যে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হয়েছে তাকে কি বলে ?	(b) আলোকমণ্ডল, বায়ু-মণ্ডল, তাপমণ্ডল।
(c) সূর্যের নিকটতম গ্রহের নাম কি ?	(c) বুধ, শুক্র, প্লুটো।
(d) পৃথিবীর নিজের কক্ষপথে কোনদিক থেকে কোনদিকে ঘুরছে ?	(d) পূর্ব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পূর্বে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

জীব

প্রতিদিন আমাদের বহু জিনিস নিয়েই কাজ কর্‌তে হয়। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তাদের সংগে আমাদের সম্পর্ক। প্রয়োজন থাক্ বা না-থাক্, কাজে লাগাই কি লাগাই না, যে সব জিনিসকে আমরা সারাদিন দেখি—তাদের প্রধানত দু'ভাগে ভাগ কর্‌তে পারি।

(১) **জীব**—যে সব পদার্থের চেতনা আছে, বা যাদের প্রাণ আছে তাদের বলা হয় জীব বা সচেতন পদার্থ, যেমন—গরু, পাখী, মানুষ, গাছপালা ইত্যাদি।

(২) **জড়-পদার্থ**—যে সব পদার্থের চেতনা নেই বা যাদের মধ্যে প্রাণের কোন স্পন্দন নেই তাদের বলা হয় জড় পদার্থ বা অচেতন পদার্থ। যেমন—লোহা, পাথর, মাটি, ঘটি, বাটি ইত্যাদি।

জীবের বৈশিষ্ট্য

এই যে আমরা বস্তু জগতকে দু'ভাগে ভাগ করছি, তা' তাদের বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য আমরা তাদের আলাদা দলে ফেলছি। এখন দেখ্‌বো আমরা যাদের জীব বল্‌ছি তাদের মধ্যে কি কি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

(ক) জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজ দেহ বৃদ্ধি। অর্থাৎ তারা খাদ্য গ্রহণ করে, দিনে দিনে নিজেদের পুষ্ট করতে পারে। খাদ্য গ্রহণ করেই তারা বেঁচে থাকে। দেখে থাক্‌বে, বিড়াল ছানা কত ছোটটি হয় তারপর মায়ের দুধ আরো অন্য নানারকম জিনিস খেয়ে খেয়ে দিনে দিনে তারা কেমন বড় হয়।

(খ) জীবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল—জীব শ্বাস-প্রশ্বাস কার্যে সক্ষম। শ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়া জীব বাঁচতে পারে না। পোকামাকড় বা যে কোন জীবকে আবদ্ধ অবস্থায় রেখে দিলে দিন কয়েকের মধ্যে মরে যায়। পাত্র মধ্যস্থিত বায়ুর অক্সিজেন ফুরিয়ে গেলেই তারা মরে যায়। তোমরা বল্‌তে পার মাছ কি করে জলের ভেতর শ্বাস নেয়? হ্যাঁ, ওরাও শ্বাস নেয় তবে অন্যভাবে। ওরা ফুলকার সাহায্যে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। এতে ওদের শ্বাস-কার্য চলে। অনেক সময় দেখা যায় বর্ষাকালে পুকুরে মাছ সব ভেসে ওঠে। তার কারণ হ'ল—বর্ষায় পুকুরের ধারের গাছপালার পাতা জলে পচে এক ধরনের গ্যাস সৃষ্টি হয়। ফলে, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ভাগ কমে যায়, তাই মাছরা জলের ওপরে উঠে মুখ নাড়তে থাকে।

(গ) জীবের ধর্ম হল যে কোন উপায়ে বংশ বিস্তার করা। কুকুর, গরু, বিড়াল প্রভৃতি স্তন্যপায়ী জন্তুরা বাচ্চা দেয়। আবার পাখীরা ডিম পাড়ে, তার থেকে বাচ্চা হয়।

(ঘ) জীবের প্রাণ আছে। তারা নিজেদের সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু সচেতন। এই আত্মচেতনা শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে প্রবল পরিমাণে দেখা যায়। বোধশক্তিও তাদের আছে।

(ঙ) যে কোন জীবই প্রাকৃতিক যে কোন রকম উত্তেজনায় সাড়া দেয়। প্রাকৃতিক উদ্দীপনা তাদের প্রত্যেককে যেমন উত্তেজিত করে, তেমনি সেই উত্তেজনা অনুযায়ী তারা প্রতিক্রিয়াও করে। মানুষ চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেয়। ত্বক দিয়ে স্পর্শের অনুভূতি পায়, নাক দিয়ে গন্ধের অনুভূতি পায়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় তাদের সমস্ত রকম জ্ঞানের মূল। মার্‌লে আমরা যেমন ব্যথা অনুভব করি, গরু ঘোড়া ইত্যাদিও সেই রকম অনুভব করে।

(চ) জীবের জন্মমৃত্যু আছে। কিন্তু জড় পদার্থের জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। যেমন একজন মানুষ কবে জন্মেছিল কবে মরেছিল তা ব'ল্‌তে পারি। গরুটা কবে ম'রলো তা ব'লতে পারি, কিন্তু একটা পাথর কবে জন্মেছিল তা ব'লতে পারি না।

জীব ও জড়ের মধ্যে তুলনা

জীব	জড়
১। খাদ্য গ্রহণ কর্‌তে সক্ষম ; ফলে দেহের পুষ্টি হয় ; কলেবরও বৃদ্ধি পায়।	১। খাদ্য গ্রহণ করতে অক্ষম, ফলে দেহের পুষ্টিও হয় না।
২। শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা থাকে।	২। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না।
৩। জীব বংশবৃদ্ধি করতে পারে।	৩। বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতা নেই।
৪। প্রাণ, চেতনা, বোধশক্তি আছে।	৪। জড়ের কোন চেতনা, বা বোধশক্তি নেই।
৫। জীব সংবেদক অর্থাৎ উদ্দীপনায় সাড়া দেয়।	৫। উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নেই।
৬। জীবের জন্ম-মৃত্যু আছে।	৬। জন্ম-মৃত্যু কিছুই বোঝা যায় না।
৭। নড়াচড়া করবার ক্ষমতা আছে।	৭। জড় পদার্থ একেবারে অচল।
৮। জীবদেহ জ্যান্তব কোষ দিয়ে তৈরী।	৮। জড় পদার্থের দেহে কোন কোষ নেই।

(ছ) জীবের চলন-শক্তি আছে। সে এখান থেকে ওখানে নড়াচড়া করতে পারে। অর্থাৎ, তাদের গতি আছে।

(জ) জীবদেহে জ্যান্তব কোষ থাকে। এটা হ'ল প্রত্যেক জীবের বৈশিষ্ট্য। একটাই হউক কি অসংখ্যই হউক, সম্পূর্ণ জীবদেহ এই জ্যান্তব কোষ দিয়ে তৈরী।

তাহ'লে আমরা দেখ্‌ছি যে জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হবে—তার বৃদ্ধি থাক্‌বে, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষমতা থাক্‌বে, বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা থাক্‌বে, চেতনা থাক্‌বে, সে সংবেদক হবে, তার জন্ম-মৃত্যু থাক্‌বে, নড়াচড়া করবার ক্ষমতা থাক্‌বে, আর শরীর জ্যান্তব কোষ দিয়ে তৈরী হবে। এই সব বৈশিষ্ট্য থাক্‌লে তবেই তাকে আমরা জীব ব'ল্‌বো। জড় পদার্থের মধ্যে এর কোন গুণই বর্তমান থাকে না।

উদ্ভিদ্‌কে জীব বলার সার্থকতা

পূর্বেই আমরা গাছপালা বা সাধারণ অর্থে উদ্ভিদকে জীব শ্রেণীভুক্ত করেছি। স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে উদ্ভিদ আবার জীব কি করে? গাছের কি প্রাণ আছে? হ্যাঁ, গাছেরও প্রাণ আছে। এ কথা প্রমাণ করেছেন বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। এখন দেখা যাক জীবের বৈশিষ্ট্য ব'ল্‌তে আমরা যা বলেছি তা এই উদ্ভিদের মধ্যে আছে কি না।

উদ্ভিদ খাদ্যগ্রহণ কর্‌তে পারে। গাছ মাটি থেকে রস নিয়ে বায়ুর সাহায্যে তাই দিয়ে দেহের পুষ্টিসাধন করে। একটা ছোট গাছ লাগালে দেখা যায় সেটা দিনে দিনে ডালপালা ছড়িয়ে বিস্তার করতে পারে।

গাছের জীবন ধারণের জন্য শ্বাসকার্যও অপরিহার্য। একটা গাছকে

যদি বায়ুশূন্য অবস্থায় রেখে দেওয়া যায় তাহ'লে সেও অন্যান্য জীবের মত বায়ুর অভাবে শ্বাসকার্য চালাতে না পেরে মরে যায়। গাছের শ্বাসকার্য হয় পাতার সাহায্যে।



৩৮নং চিত্র—জগদীশচন্দ্র বসু

গাছেরও বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা আছে। ফুল থেকে ফল হয়, ফল থেকে হয় বীজ, সেই বীজ মাটিতে পুঁত্‌লে আবার হয় গাছ। আমরা যদি স্ব-ইচ্ছায় মাটিতে নাও পুঁতি, মাটিতে বীজ পড়ে এমনি আবার গাছ হয়।

গাছকে আমরা আপাত দৃষ্টিতে নিশ্চল দেখ্‌লেও তার বিভিন্ন অংশ সচল। সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় হেঁটে বেড়াতে পারে না ঠিকই, কিন্তু তার শরীরের বিভিন্ন অংশের গতি আছে। মূল জলের জন্য মাটির তলায় বিস্তার লাভ কর্‌তে থাকে আবার কাণ্ড মাটি ভেদ করে ওপরের দিকে উঠ্‌তে থাকে।

গাছের চেতনা বা বোধশক্তি আছে। একটা অন্ধকার ঘরে যেখানে জানালার ছিদ্র দিয়ে সামান্য আলো আস্‌ছে, সেখানে যদি একটা টব রাখা যায় দেখা যাবে যে গাছের কাণ্ডটা আস্তে আস্তে



৩৯নং চিত্র—টবের গাছ

ঐ আলোকরশ্মি যেদিক থেকে আসছে সেদিকে বেঁকে গেছে। জলের ধারে যে সব গাছ থাকে, দেখা যায় তাদের শিকড়গুলো সব ঐ দিকে যেতে থাকে। গাছের যে স্পর্শকাতরতা আছে তা লজ্জাবতী লতাকে দেখ্‌লে বেশ বোঝা যায়।

অন্যান্য জীবের মত গাছের দেহও বহু কোষ দিয়ে তৈরী।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্ভিদের মধ্যে জীবের সমস্ত রকম বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই কারণেই উদ্ভিদকে জীব বলা হয়। তবে উদ্ভিদকে জীব বললেও সাধারণ প্রাণীর সংগে তার অনেক তফাৎ আছে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনা

উদ্ভিদ	প্রাণী
১। সাধারণভাবে দেখতে গেলে উদ্ভিদের দেহের কোন গতি নেই। অর্থাৎ উদ্ভিদ এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে পারে না।	১। প্রাণীর দেহের গতি আছে।
২। শরীরের সব অংশ সমান হারে বাড়ে না। দেহের নির্দিষ্ট আকারওবিশেষ নেই।	২। শরীরের সকল অংশ সমান তালে বাড়ে। দেহের আকার আছে।
৩। কোন ইন্দ্রিয় নেই।	৩। প্রায় প্রাণীরই ইন্দ্রিয় থাকে।
৪। পাতার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়; কোন পৃথক যন্ত্র থাকে না।	৪। সাধারণত পথক শ্বাসযন্ত্র থাকে।
৫। শুধুমাত্র তরল খাদ্য গ্রহণ করতে পারে।	৫। সব রকম খাদ্যই গ্রহণ করতে পারে।
৬। মাটির রস থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে।	৬। কিন্তু নাইট্রোজেন জাতীয় খাদ্যের জন্য প্রাণীকে উদ্ভিদ অথবা অন্য কোন প্রাণীর উপর নির্ভর করতে হয়।
৭। দেহের সবুজ কণার সাহায্যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে কার্বনঘটিত খাদ্য তৈরী করে।	৭। দেহে সবুজ কণা থাকে না, তাই ঐ উপায়ে খাদ্য তৈরী করতে পারে না।

উদ্ভিদের শ্রেণী বিভাগ

পৃথিবীতে যত উদ্ভিদ দেখা যায় তাদের আমরা প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। একদল উদ্ভিদ দেখা যায় যাদের ফুল বা বীজ কিছুই হয় না। এদের বলা হয় অবীজ উদ্ভিদ্। আর এক দল আছে যাদের ফুল বীজ হয়, তাদের বলা হয় সবীজ উদ্ভিদ্।

অবীজ উদ্ভিদ্ আবার তিন রকমের হয়—সমাঙ্গদেহী, মস্, আর ফার্ণ।

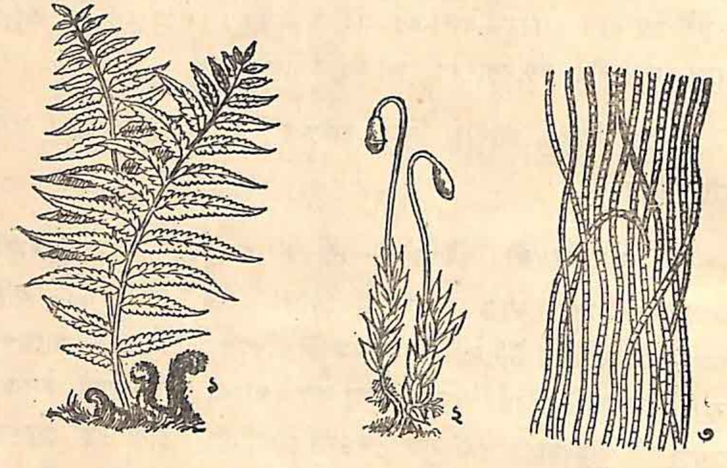
(১) **সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদ্ :**—এদের দেহের সমস্ত অংশই একরকম। মূল, কাণ্ড বা পাতা বোঝা যায় না। এরা হ'ল সবচেয়ে নিম্নস্তরের উদ্ভিদ, এই সমাঙ্গ উদ্ভিদেরও দু'টো ভাগ আছে—(ক) **শৈবাল**—এদের দেহে সবুজ কণা থাকে, তাই এদের সবুজও দেখায়। পুকুরঘাটে যে সব শেওলা দেখা যায় তারা এই জাতীয় উদ্ভিদ্। (খ) **ছত্রাক**—এদের দেহে সবুজ কণা থাকে না। দেখ্তে সাদা-সাদা হয়। তোমরা যাকে ব্যাঙের ছাতা বল সেটা এই জাতীয় উদ্ভিদ্।

(২) **মস্ :**—এই উদ্ভিদের কাণ্ড আর পাতা দেখা যায় কিন্তু শেকড় থাকে না। দেখতে সবুজ হয়। পুরানো দেওয়ালে যে সব শেওলা পড়ে তারা হ'ল এই জাতীয় উদ্ভিদ।

(৩) **ফার্ণ :**—ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা তিনটি বর্তমান থাকে। সাধারণ গাছের মত এদের সবকিছু থাকে, শুধুমাত্র ফুল আর ফল হয় না। এরা অবীজ উদ্ভিদের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্তরের।

সবীজ উদ্ভিদও দু' রকমের হয়—

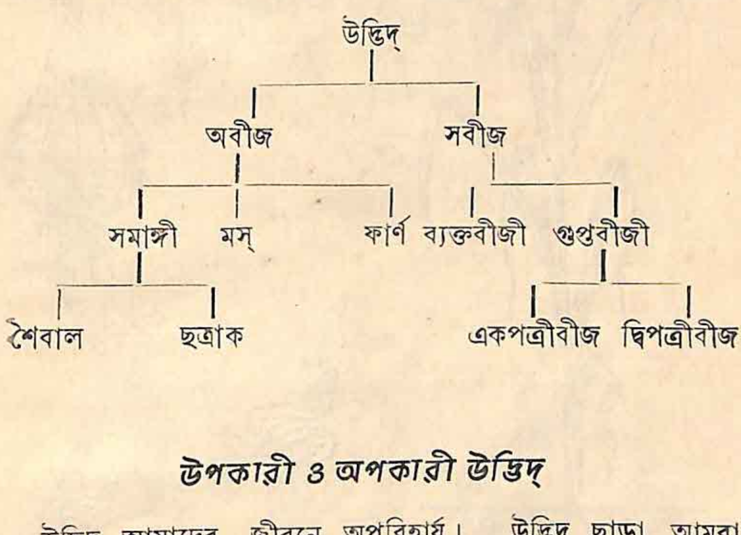
(১) **ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ্**—এইসব গাছে কোন ফল হয় না। এদের বীজের কোন খোলস নেই। পাইন গাছ এই জাতীয় উদ্ভিদ।



৪০নং চিত্র—

(১) ঢেঁকি শাক (২) মস্, (৩) শেওলা, (৪) ছাতা, (৫) ব্যাঙের ছাতা

(২) **গুপ্তবীজী উদ্ভিদ্**—এইসব গাছে ফল হয়। বীজ ফলের ভেতর থাকে। বীজের ভেতর যে পত্র থাকে তার সংখ্যা অনুযায়ী গুপ্তবীজী উদ্ভিদ্‌কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) একপত্রী বীজ উদ্ভিদ্—এই উদ্ভিদের বীজে একটি মাত্র পত্র থাকে, যেমন—ভুট্টা, ধান, ইত্যাদি। (খ) দ্বিপত্রী বীজ উদ্ভিদ—এইসব উদ্ভিদের বীজে দুটি করে পত্র থাকে। যেমন,—আম, জাম, ছোলা ইত্যাদি।

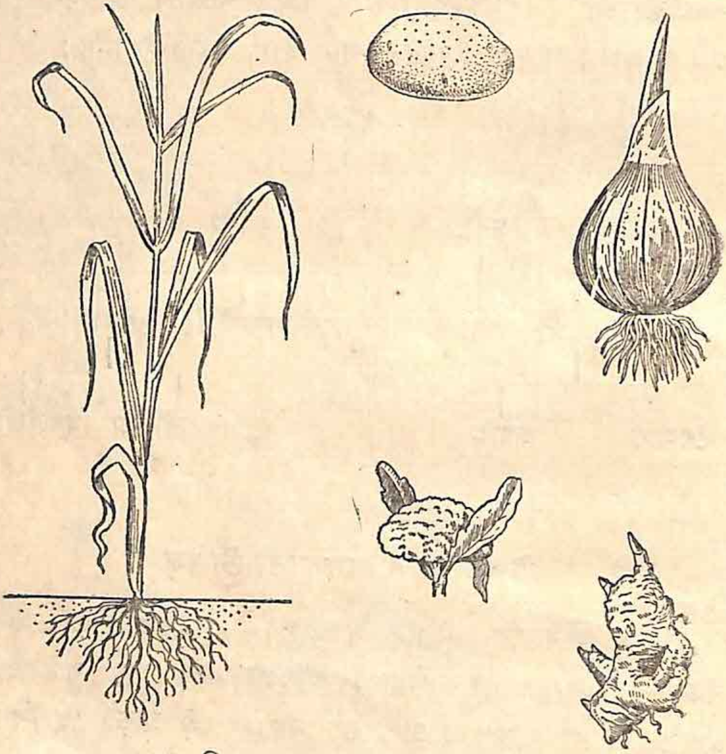


উপকারী ও অপকারী উদ্ভিদ্

উদ্ভিদ্ আমাদের জীবনে অপরিহার্য। উদ্ভিদ্ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। শ্বাস-প্রশ্বাস, খাদ্যগ্রহণ সবকিছু সঠিকভাবে চালাতে হ'লে উদ্ভিদ্ ছাড়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া ছোটখাটো প্রয়োজনীয়তা তো আছেই। আবার অনেক উদ্ভিদ্ আছে যারা আমাদের কাজে লাগে না, উপরন্তু অপকারও করে। তাই এই প্রয়োজনীয়তা মেটানোর দিক থেকে উদ্ভিদ্‌কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—যারা আমাদের নানারকম কাজে লাগে তারা হ'ল

উপকারী উদ্ভিদ্, আর যারা আমাদের বিনিষ্ট করে তারা হ'ল অপকারী উদ্ভিদ্।

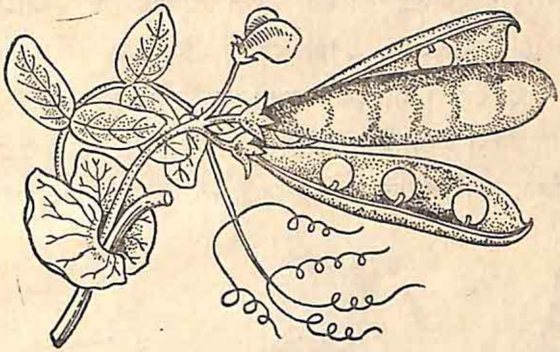
উপকারী উদ্ভিদ্—জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন খাদ্যগ্রহণ। আমাদের খাদ্যের প্রধান উপকরণ হ'ল ধান বা গম। এই ধান



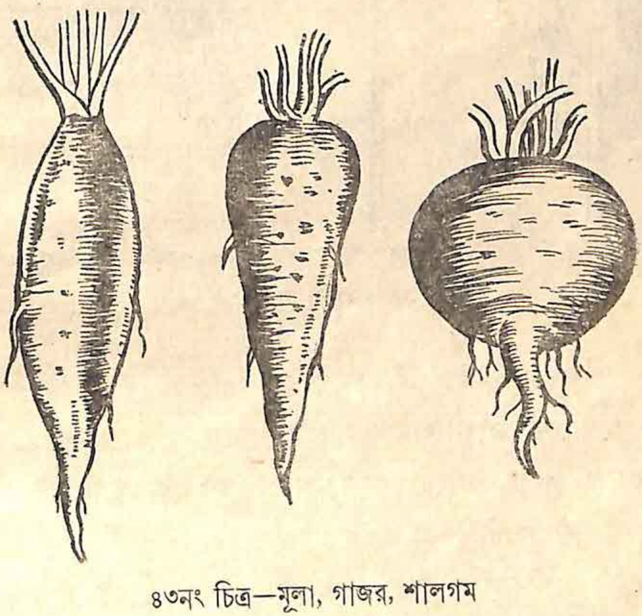
৪১নং চিত্র—ধান, কপি, আপু, আদা, পেঁয়াজ

আর গম পাই উদ্ভিদ্ থেকে—ধান গাছ, যব গাছ বা গম গাছ থেকে। আবার মটর, ছোলা, মুগ, মুসুর প্রভৃতি গাছের বীজ থেকে নানারকম ডাল তৈরী হয়। ভাত আমরা তরকারী ছাড়া খেতে

ভালবাসি না। কাঁচা না খেলেও বিভিন্ন গাছের পাতা—পালং বাঁধাকপি, আমরা রান্না করে খাই। এ ছাড়া, কিছু গাছের মূলও খাই।

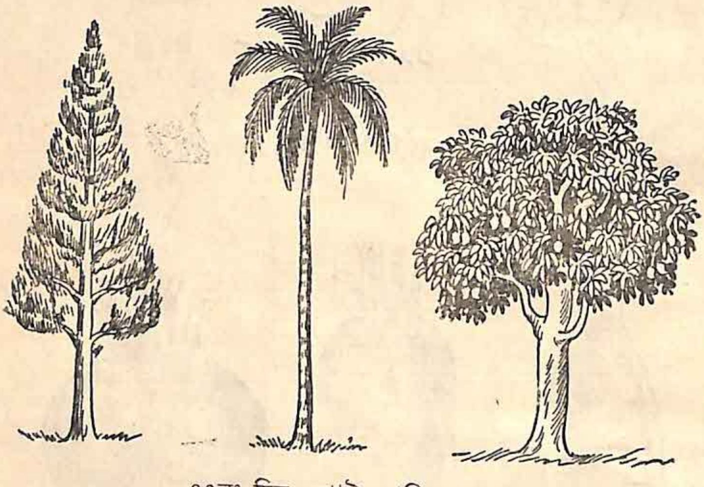


৪২নং চিত্র—মটর



৪৩নং চিত্র—মূলা, গাজর, শালগম

যেমন—গাজর, মূলা, বীট্। কিছু গাছ আছে যাদের মাটির নীচের কাণ্ড আমরা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করি, যেমন—আলু, ওল, আদা ইত্যাদি, আবার বিভিন্ন গাছের ফলও আমরা খাই,—লাউ, পটল, কুমড়ো। এ ছাড়া আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি পাকা ফল খুব সুস্বাদু। কতকগুলো গাছের বীজ থেকে তেল তৈরী হয়; যেমন—সর্ষে, বাদাম, তিল ইত্যাদি। এ ছাড়া মিষ্টান্ন তৈরী করার জন্য আমরা আখ, খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের রসও ব্যবহার করি। তাহ'লে



৪৪নং চিত্র—ঝাউ, নারিকেল, আম

আমরা দেখ্তে পাচ্ছি বিভিন্ন উদ্ভিদ্ তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ দিয়ে আমাদের জীবন ধারণে সাহায্য কর্ছে। কারো বীজ, কারো ফল, কারো পাতা, কারো কাণ্ড, কারো মূল, সবকিছু নিয়েই আমরা আমাদের খাদ্যসামগ্রী তৈরী কর্ছি।

অনেক প্রাণী আছে যারা কেবলমাত্র পাতা খেয়েই বেঁচে থাকে।

তাহলে একথা বলা যেতে পারে যারা মাংসাশী প্রাণী তাদের খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের কি প্রয়োজন ? হ্যাঁ, তাদেরও প্রয়োজন আছে। বাঁচবার জন্য উদ্ভিদ জড়-জগৎ থেকে সবরকমই উপাদান গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু প্রাণীরা জল, লবণ ও অক্সিজেন ছাড়া আর কিছু সোজাসুজি গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তাদের বাঁচার জন্য এগুলো সব কিছুরই প্রয়োজন আছে। তাই অন্যান্য প্রাণী সে সব খাদ্য প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম নয় বলে যে সব প্রাণী উদ্ভিদ খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের মাংস খায়, ফলে পরোক্ষভাবে এইসব উপাদান গ্রহণ করে।

শুধু খাদ্য নয়, উদ্ভিদকে আমরা ঔষধ হিসাবেও ব্যবহার করি। প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বা কবিরাজী ঔষধ সব গাছগাছড়া থেকেই তৈরী হয়। দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো অসুখেও আমরা এইসব ভেষজ ঔষধ প্রয়োগ করি। সর্দ্দি কাশি হ'লে মা আমাদের আদা আর তুলসী পাতার রস খাওয়ান। বাসক পাতার রসেও টানকাশি কমে যায়। তাল মিছরিও বেশ উপকারী। ম্যালেরিয়া সারে শিউলি পাতার রসে। আবার সিংকোনা গাছের ছাল থেকে ম্যালেরিয়ার মহৌষধ কুইনাইন তৈরী হয়। নিম ডাল অথবা স্বয়ম্বর গাছের ডালের দাঁতনে দাঁত ভাল হয়। আজকালকার অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ—পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসেটিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি সমাঙ্গী জাতীয় উদ্ভিদ থেকেই তৈরী হয়।

আমরা পরবার কাপড়ও পাই উদ্ভিদের কাছ থেকে। কার্পাস তুলো থেকে সূতো তৈরী করে আমাদের কাপড় তৈরী হয়। আজকাল তুলো আর বাঁশকে মিশিয়ে এক ধরনের কৃত্রিম রেশম তৈরী করা হ'চ্ছে। পাট, শণ ইত্যাদি দিয়ে চট থলে ইত্যাদি তৈরী হয় ; দড়িও হয়।

বড় বড় গাছের ডালপালা থেকে জ্বালানী হয়। শাল, সেগুন প্রভৃতি কাঠের তক্তা থেকে নানারকম সৌখিন আসবাবপত্র তৈরী হয়। বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ তৈরী করা হয়।

সৌখিনতার জন্যও আমরা উদ্ভিদ্ ব্যবহার করি। নানারকম ফুলের গাছ দিয়ে বাগান সাজিয়ে রাখি। আবার টবে এমন অনেক গাছ থাকে যার ফুল হয় না; তাদের পাতার সৌন্দর্য্যের জন্য আমরা যত্ন করি। ঝাউগাছ লাগাই দেখ্‌তে সুন্দর বলে। বাড়ীতে কেউ এলে যে আপ্যায়ন করি তাও গাছের পাতা—চা দিয়ে।

উদ্ভিদ আমাদের নানারকম কাজেই লাগে। এখানে তার সামান্য কিছু নিয়ে আলোচনা করলাম মাত্র। এর থেকেই তোমারা বুঝ্‌তে পারবে উদ্ভিদের উপর আমাদের কতখানি নির্ভর করতে হয়। আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশে প্রত্যেকেরই উদ্ভিদের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

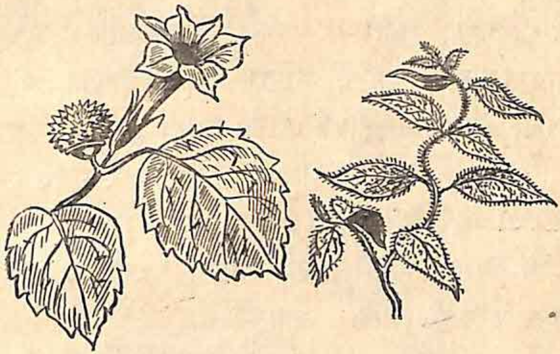


৪৫নং চিত্র— রজনীগন্ধা

অপকারী উদ্ভিদ্—কিছু গাছ আর আগাছা আছে যারা আমাদের কিছু প্রয়োজনে লাগে না অথচ জমির ভিতর জন্মে জমির উর্বরতা কমিয়ে দেয়। এদের দ্বারা শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। যেমন—উলুখড়, ঘাস ইত্যাদি।

এক ধরনের উদ্ভিদ আছে যারা নিজেরা মাটি থেকে রস নিতে পারে না। অন্য গাছের কাণ্ড থেকে রস এনে জীবন ধারণ করে। এদের বলা হয় পরগাছা। এরা গাছের উৎপাদন শক্তি কমিয়ে দেয়। অনেক সময় গাছ ছোট হ'লে মেরেও ফেলে।

ধুত্‌রা অথবা কর্‌বীজের বীজ খুবই বিষাক্ত। যদিও ধুত্‌রা বীজ শোধণ করে এ্যাট্রোপিন পাওয়া যায়।



৪৬নং চিত্র—ধুত্‌রা, বিছুটি

গ্রাম অঞ্চলে এক ধরনের গাছ দেখা যায় তাদের বলে বিছুটি। এই গাছের কোন অংশ যদি শরীরে স্পর্শ করে তাহ'লে সেখানটা চুল্‌কাতে থাকে, জ্বালাও করে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ফুলে যায়। এছাড়া কিছু গাছ আছে, যারা অন্য উপায়ে উপকারী হ'লেও তাদের কোন বিশেষ অংশ আমাদের ক্ষতি করে। কোন কোন গাছের আঠা শরীরে পড়লে ঘা হ'য়ে যায়।

ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ যদি আমাদের খাদ্যদ্রব্যে এসে পড়ে তাহ'লে তা সম্পূর্ণ খাদ্যদ্রব্যকে নষ্ট করে দেয়। কাপড়, জুতা প্রভৃতিতেও বর্ষাকালে এই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মায়।

চা, তামাক, মরফিন প্রভৃতির যেমন উপকার আছে তেমনি অধিক পরিমাণে ব্যবহার কর্‌লে অপকারও প্রচুর হয়। এটা অবশ্য মানুষের ব্যবহারের উপর নির্ভর কর্‌ছে।

প্রাণীর শ্রেণী বিভাগ

এই পৃথিবীতে বহু প্রাণীর বাস। জলে স্থলে বাতাসে তারা যে যার রাজ্য বিস্তার করেছে। একম অনেক প্রাণী হয়তো আছে যাদের অস্তিত্বের কথা এখনও আমরা জান্‌তে পারিনি ; যাদের কথা আমরা জানি, বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তাদের দু' প্রধান অংশে ভাগ কর্‌তে পারি—(১) অমেরুদণ্ডী প্রাণী, যাদের মেরুদণ্ড নেই, এবং (২) মেরুদণ্ডী প্রাণী, যাদের মেরুদণ্ড আছে।

(১) **অমেরুদণ্ডী প্রাণী**– দেহ গঠনের উৎকর্ষ অনুযায়ী এদের নয়টি পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) আদ্য প্রাণী বা প্রোটোজোয়া—এদের দেহ একটা মাত্র কোষ দিয়ে তৈরী। খাওয়া চলাফেরা সবকিছু এই কোষের সাহায্যে হয়। একটা কোষ বিভক্ত হ'য়ে দু'টো হ'য়ে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। জলে এদের বাস।

এমিবা এই জাতীয় প্রাণী।

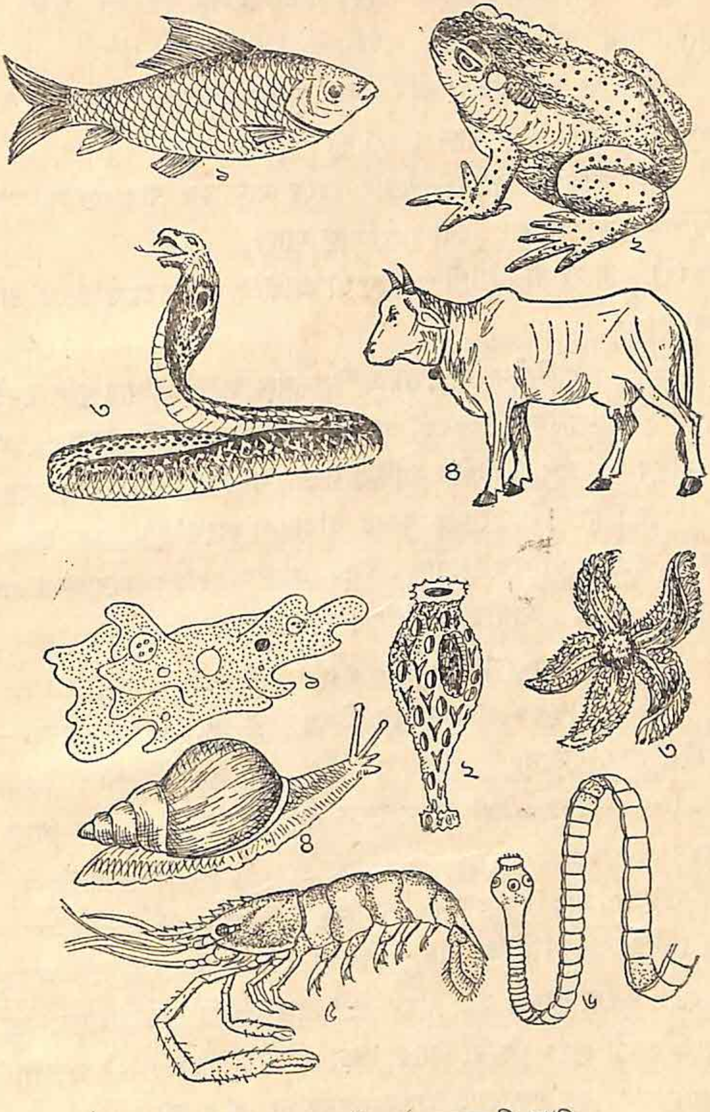
(খ) ছিদ্রাল প্রাণী—এদের দেহে কোষের দু'টো স্তর থাকে। জলে বাস করে। যেমন—স্পঞ্জ।

(গ) একনালী দেহী প্রাণী—এদের শরীর শুধুমাত্র খাদ্যনালী দ্বারাই গঠিত। জলে বাস করে। যেমন—হাইড্রা, প্রবাল ইত্যাদি।

(ঘ) কণ্টকত্বক্ প্রাণী—এদের ত্বকে কাঁটা থাকে। জলে বাস করে। যেমন—তারা মাছ।

(ঙ) গোল কৃমি—মানুষের পেটে যে কৃমি দেখা যায়। দেখ্‌তে গোল, লম্বা সূতার মত।

(চ) চেপ্টা কৃমি—সাধারণত গৃহপালিত পশুর যকৃত ও পিত্তাশয়ে এদের দেখা যায়। দেখ্‌তে চেপ্টা বিচ্ছুর মত।



৪৭নং চিত্র—মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী

(ছ) অঙ্গুরিমাল—এদের দেহ কতকগুলো পর পর সাজানো আংটা দিয়ে তৈরী মনে হয়। যেমন—কেঁচো, জেঁাক।

(জ) শম্বুক—এদের নরম দেহ চুনময় খোলের মধ্যে থাকে। ভেতরের অংশটা খুবই নরম। যেমন—ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি।

(ঝ) সন্ধিপদ প্রাণী—এদের দেখে মনে হয় কতকগুলো অংশ পর পর জুড়া আছে। যেমন—চিংড়ি মাছ।

(২) **মেরুদণ্ডী প্রাণী**—মেরুদণ্ডী প্রাণীকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) করোটিহীন মেরুদণ্ডী প্রাণী, অর্থাৎ যাদের মাথার খুলি নেই, আর (২) করোটিযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী, যাদের মাথার খুলি আছে ; যেমন —মানুষ। করোটি বিহীন প্রাণীরা গভীর সমুদ্রের তলায় বাস করে।

করোটিযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—
(ক) **অনুষ্ণ শোনিত প্রাণী**—এইসব প্রাণীর দেহের রক্তের উত্তাপ নেই। এদেরও আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

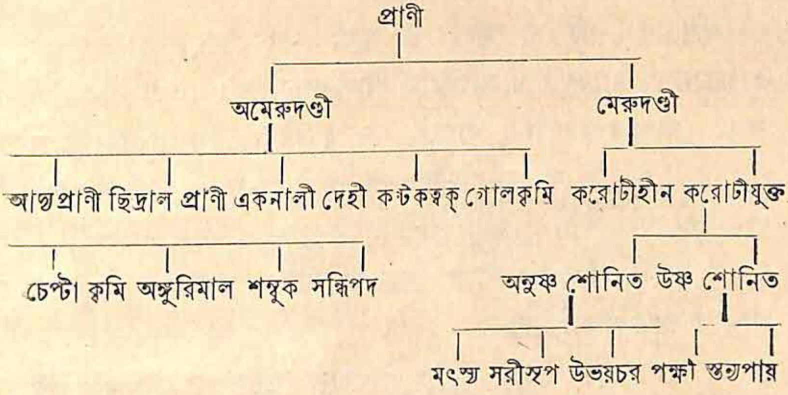
(১) মৎস্য—এরা জলে বাস করে ; রুই, কাতলা ইত্যাদি।

(২) সরীসৃপ—এরা বুকের উপর ভর দিয়ে চলে। যেমন—কুমীর, সাপ, ইত্যাদি।

(৩) উভচর—এরা জলে-স্থলে দু' জায়গায়ই থাক্‌তে পারে। যেমন—ব্যাঙ।

এছাড়া আর এক ধরনের করোটিযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণী হ'ল ঃ—

(খ) **উষ্ণ শোনিত প্রাণী**—এদের রক্তের নিজস্ব উত্তাপ আছে। এদেরও দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পক্ষী—এরা ডিম পাড়ে, তার থেকে বাচ্চা হয়। ডানা আছে, উড়তে পারে। আর (২) স্তন্যপায়ী, এদের বাচ্চা হয় এবং সেই বাচ্চা মায়ের দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে।



উপকারী ও অপকারী প্রাণী

আগেই বলেছি এই পৃথিবী বহু প্রাণীর বাসভূমি। সবাই বাঁচতে চায়। আর চায় ভালভাবে বাঁচতে। মানুষ যেমন চায় গরুর দুধ খেয়ে নিজেকে পুষ্ট কর্‌তে ; মুরগীর, ছাগলের মাংস খেয়ে ক্ষমতা বাড়াতে তেম্‌নি বাঘ সিংহও চায় মানুষকে বা অন্য প্রাণীকে খেয়ে বেঁচে থাক্‌তে। মানুষ হ'ল সবচেয়ে উন্নততর প্রাণী। সে তার আশেপাশে আর যে সব প্রাণী আছে, তাদের কিছুকে বশ করে নিজের প্রয়োজনে লাগাতে পার্‌ছে, আবার কিছু প্রাণী আছে যারা বাঁচার জন্য মনুষ্যেরই অনিষ্ট কর্‌ছে। সুতরাং এই মানুষকে কেন্দ্র করে সমস্ত প্রাণী-জগৎকে আমরা দু'ভাগে ভাগ কর্‌তে পারি। যারা মানুষের উপকারে লাগে তারা হ'ল উপকারী প্রাণী আর যারা মানুষের অপকার করে তারা হ'ল অপকারী প্রাণী।

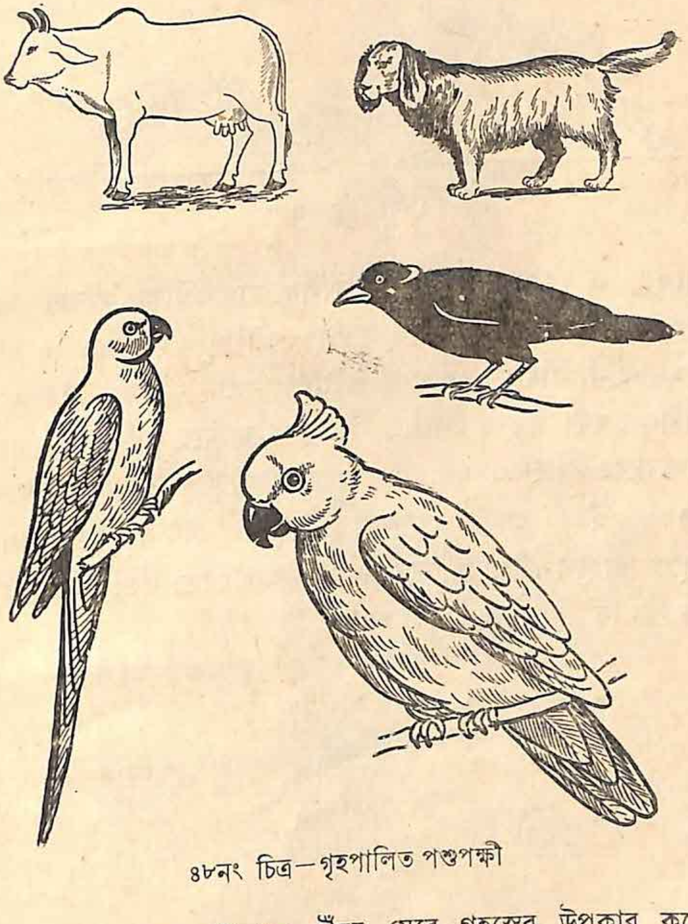
উপকারী প্রাণী :—সাধারণত প্রাণীদের কাছ থেকে তিন রকমের উপকার পাই। কতকগুলো খাদ্য যোগায় বা খাদ্য সামগ্রী হিসাবে কাজ করে, কতকগুলো আমাদের ব্যবহার সামগ্রী জোগায় আর বাকী কতকগুলোকে বশ করে আমরা আমাদের কাজের লাঘব করি।

শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য মাছ, মাংস, ডিম বা দুধ-এর প্রয়োজন। মাছের চাষ আজকাল বহুল প্রচারিত। এছাড়া গভীর সমুদ্র থেকে মাছ ধরারও ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, ডিম খাওয়ার জন্য হাঁস মুরগী ইত্যাদি আমরা বাড়ীতে পুষি। আর ছাগল, ভেড়া, শূকর প্রভৃতির মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দুধের জন্য গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি আমরা পুষে থাকি। অনেকে গাধা, উট প্রভৃতির দুধও খায়।

আবার ভেড়ার লোম থেকে শীতবস্ত্র তৈরী হয়। খুব বেশী শীত প্রধান দেশে পশুর চামড়া গায়ে দেওয়ারও চলন আছে। জুতো তৈরীর কাজে লাগে গরু, ভেড়া, মহিষ, হরিণ প্রভৃতির চামড়া। সাপের চামড়া দিয়েও অনেক সময় সৌখিন জুতো তৈরী হয়। এ ছাড়া গুটিপোকা থেকে রেশম তৈরী হয়, এবং তার থেকে কাপড় হয়, তাই আজকাল গুটিপোকার চাষ বহুল প্রচারিত।

এ ছাড়া পশুকে কাজে লাগাই আমাদের ভার বা কষ্ট লাঘব করার জন্য। মানুষ বুদ্ধিমান জীব, সে চায় আরাম। তাই সে বুদ্ধি খরচ করে অন্যান্য পশুকে বশ করে নিজের কাজে লাগায়। যেমন—গরুকে দিয়ে লাঙ্গল টানায়, ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়, মহিষ, গরু, ঘোড়া এদের সবাইকে দিয়ে আবার গাড়ী চালায়। উট, গাধা, হাতি প্রভৃতির পৃষ্ঠে করে মাল বহিয়ে নেয়, হাতিকে দিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ আনায়, উটের পিঠে চেপে মরুভূমির উপর নিরাপদে চলাফেরা করে, বল্‌গা-হরিণ বা কুকুর দিয়ে বরফের উপর শ্লেজ-গাড়ি টানায়, সুতরাং দুস্তর মরু থেকে সুরু করে ঠাণ্ডা বরফের উপর সব জায়গায়ই যাতায়াত অথবা ভার বহনের জন্য পশুরা আমাদের সাহায্য করছে।

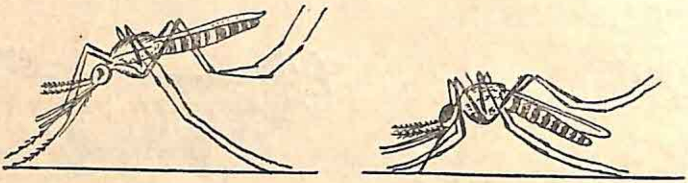
এ ছাড়া কিছু গৃহপালিত পশু আছে যারা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করে। যেমন—কুকুর, টিয়া, ময়না প্রভৃতি পাখী আমাদের



৪৮নং চিত্র—গৃহপালিত পশুপক্ষী

ঘর পাহারা দেয়, বিড়াল ইঁদুর মেরে গৃহস্থের উপকার করে। শোনা যায় নাকি পুরাকালে পায়রারা সংবাদ আদান-প্রদান করতো।

অপকারী প্রাণী ঃ—যে সব প্রাণী আমাদের প্রত্যক্ষভাবে অপকার করে তার মধ্যে প্রথম আসে মশা ও মাছি। মশা নানা জাতের



৪৯নং চিত্র—মশা

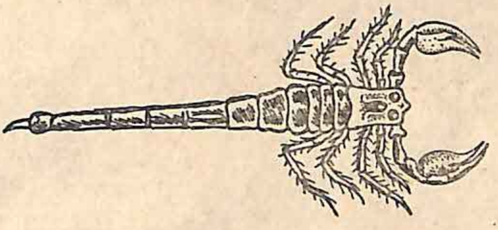
আছে। এদের মধ্যে স্ত্রী এ্যানোফিলিস ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে। কিউলেক্স, মশা ফাইলেরিয়ার জীবাণু বহন করে। মাছি আমাদের না কামড়ালেও ওদের শরীরের সংগে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু বয়ে নিয়ে আসে। এ ছাড়া কালাজ্বরের বাহকও হ'ল এক ধরনের কীট। উকুন টাইফাসের বাহক। ইঁদুর প্লেগের বাহক। এইসব কীট-পতংগদের ধ্বংস করতে পারলে রোগের বিস্তার কমে। সাধারণতঃ পতংগদের মারার জন্য ডি. ডি. টি. ব্যবহার করা হয়।



৫০নং চিত্র—মৌমাছি, বোলতা

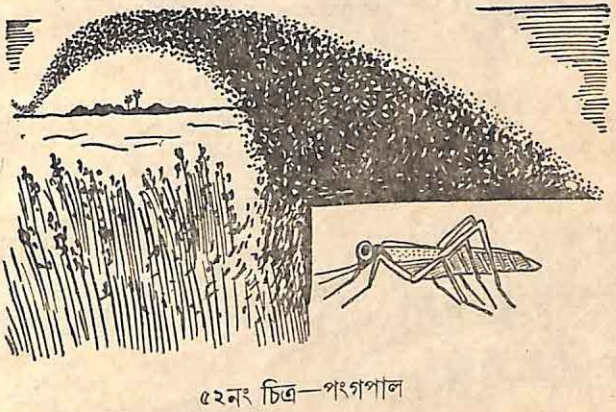
বোলতা, মৌমাছি, বিছা প্রভৃতি আমাদের অপকার করে।

এদের কামড়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। সাপের তো কথাই নেই। আবার পাগলা শেয়াল, কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়।



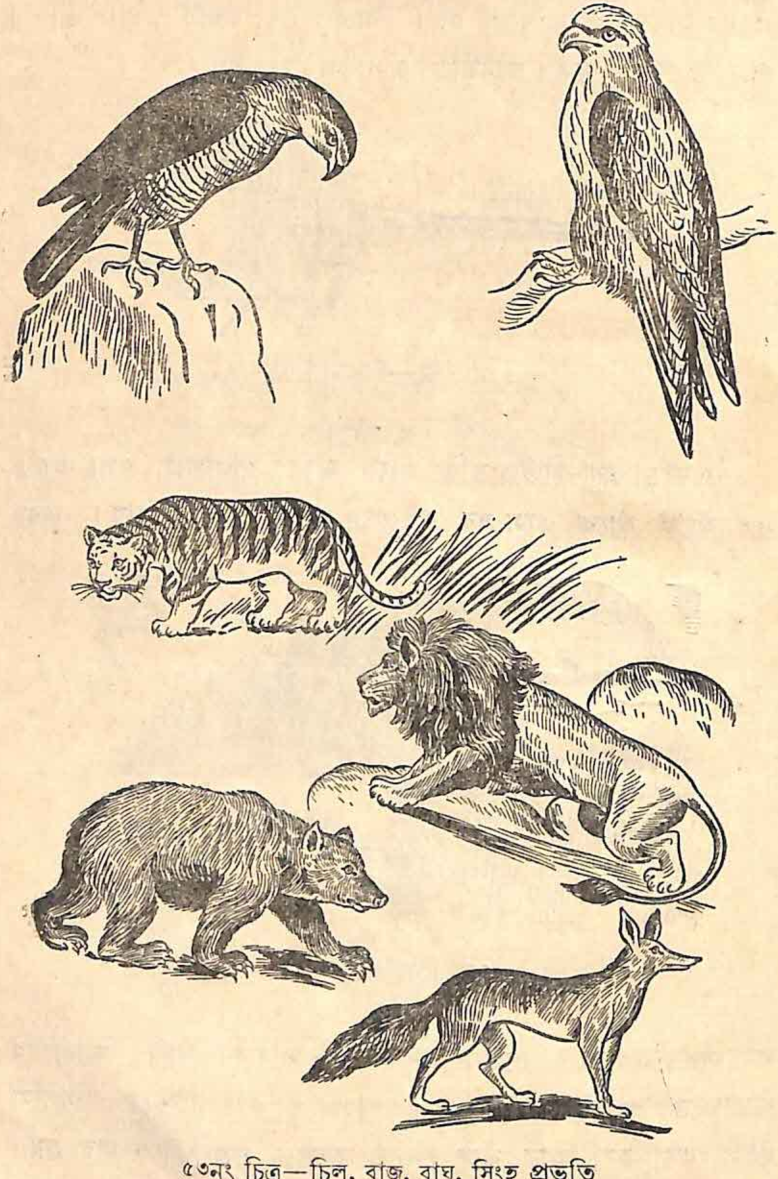
৫১নং চিত্র—কাঁকড়া বিছা

এ ছাড়া এক জাতীয় ফড়িং আছে যাদের পংগপাল বলা হয়। এরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সব শস্যক্ষেত্র নষ্ট করে দিয়ে যায়। এরা



৫২নং চিত্র—পংগপাল

সব সময় দলবেঁধে চলে। নানারকম সাধারণ পাখীও আমাদের শস্যক্ষেত্রের প্রভূত ক্ষতি করে। আকাশে ওষুধ ছিটিয়ে পংগপাল ধ্বংস করা হয়, আর ফাঁদ পেতে অন্যান্য পশুপক্ষীকে মারা হয়।



৫৩নং চিত্র—চিল, বাজ, বাঘ, সিংহ প্রভৃতি

ইঁদুরও আমাদের খাদ্যদ্রব্য যথেষ্ট নষ্ট করে। বাদুড় রাতে গাছের ফল খেয়ে পালায়।

কতকগুলো হিংস্র পাখী আছে যারা গৃহপালিত পশুপাখীদের বাচ্চা নিয়ে খায়। যেমন—চিল, বাজ।

যে সব প্রাণীদের কথা বলা হ'ল এদের শক্তি মানুষের চেয়ে অনেক কম, তবুও এরা নানাভাবে আমাদের ক্ষতি করে, এ ছাড়া হিংস্র জন্তু তো অনেক আছেই। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে প্রভৃতি শুধু মানুষ খায় না, বাড়ীর পোষা জীবজন্তুকেও ধরে নিয়ে পালায়।

প্রশ্নাবলী

(1) জীবের বৈশিষ্ট্য কি? জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক কি কি?

(2) গাছপালা কি সজীব? কেন তা বুঝিয়ে দাও।

(3) মৃত ও নির্জীবের মধ্যে কি কি পার্থক্য আছে লেখ।

(4) উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে তুলনা কর।

(5) প্রাণীর শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

(6) উদ্ভিদ-জগৎকে কি ভাবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করবে?

(7) অপকারী প্রাণী সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(8) প্রাণীর কাছ থেকে আমরা কি কি উপকার পাই? উপকারী প্রাণীর সম্বন্ধে যা জান লিখ।

(9) উপকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটি রচনা লিখ।

(10) অপকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে যা জান লিখ। দৈনন্দিন জীবনে আমরা কি কি অপকারী উদ্ভিদ দেখতে পাই।

(11) শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(a) জড়ের জীবকোষ———প্রাণীর জীবকোষ———।

(b) উদ্ভিদ———খাদ্য গ্রহণ করে কিন্তু প্রাণী———খাদ্য গ্রহণ করে

(c) উদ্ভিদের রান্নাঘর হ'ল——।

(d) মসের পাতা আর কাণ্ড থাকে কিন্তু——থাকে না।

(e) যে সব গাছের ফল হয় না তাদের বলে——উদ্ভিদ।

(f) যে উদ্ভিদের সব দেহ এক রকম তাকে বলে——উদ্ভিদ।

(g) যে প্রাণীর দেহ একটা মাত্র কোষ দিয়ে তৈরী তাকে বলে——।

(h) যে প্রাণীর দেহ কতকগুলি আংটা দিয়ে জোড়া তাকে বলে——।

(i) বোলতা, মৌমাছি, বিছা হ'ল——প্রাণী।

(j) ধুত্‌রা হ'ল———উদ্ভিদ।